নোয়াখালি নোয়াখালি

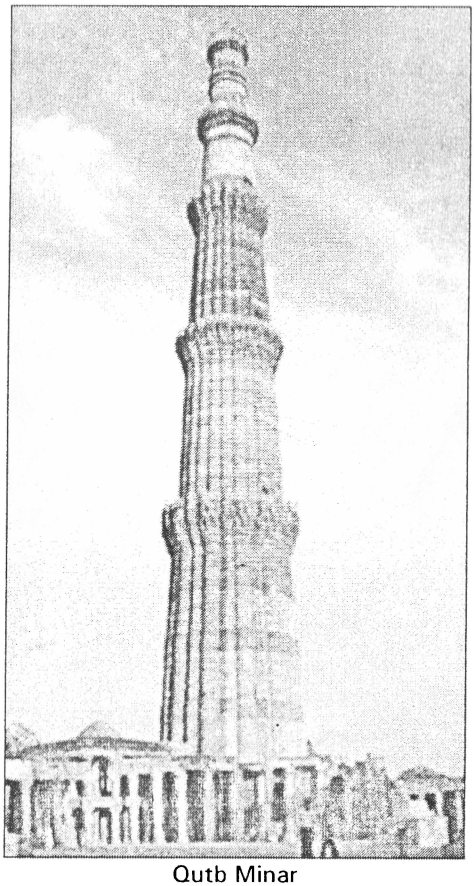


শান্তনু সিংহ

THE TRUE HISTORY OF QUTB MINAR IN DELHI

DISTORTED HISTORY OF QUTB MINAR

The **Qutb Minar** (also spelled *Qutab* or *Qutub),* a tower in Delhi, India, is the world's tallest minaret, made of red sandstone. It is 72.5 metres (238 ft) tall with 379 steps leading to the top. The diameter of the base is 14.3 meters wide while the top floor measures 2.75 meters in diameter. The authorship of this magnificent piece of architecture is attributed to the Muslim invader Qutb-ud-din Aibak and the Indian as well as the Western historians write, *"Inspired by the Minaret of Jam in Afghanistan and wishing to surpass it, Qutb-ud-din Aibak, the first Muslim ruler of Delhi, commenced construction of the Qutb Minar in 1193, but could*



Qutb Minar

নোয়াখালি নোয়াখালি

শান্তনু সিংহ

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

কার্যালয়
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম ঃ ৮.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

প্রকাশকের কথা

নোয়াখালি নোয়াখালি। হায় নোয়াখালি। তোমার উপরেই হয়েছিল পাকিস্তান তৈরীর প্রথম পরীক্ষা। না, ভুল বললাম। প্রথম সফল পরীক্ষা। কারণ, প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু সে পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন বেছে নেওয়া হয়েছিল তোমাকে। সেদিন ঘাতকের হাত থেকে তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। না। আমরা কেউ পারিনি। প্রগতিশীলরা পারিনি, অহিংসবাদীরা পারিনি, বিপ্লবীরা পারিনি, মার্কসবাদীরা পারিনি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা পারিনি, সর্বধর্ম-সমন্বয়কারীরা পারিনি, জড়বাদীরা পারিনি, এমনকি হিন্দুত্ববাদীরাও পারিনি। আমাদের সকলের সমস্ত তত্ত্ব সবকিছু চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তোমার উপর দিয়ে সফল হয়ে গেল পাকিস্তান তৈরীর পরীক্ষা।

কলকাতায় ঘাতকেরা ব্যর্থ হওয়ার পরই নোয়াখালি তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। শ্যামলা বাংলার সবুজ প্রকৃতির কোলে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, এতদূরে যে তোমার আর্তনাদ, তোমার কান্নার শব্দ কলকাতা আর দিল্লীতে পৌঁছতে যেন অনেক দেরী লাগে, পদ্মা মেঘনার সঙ্গমে, নদী নালার বেষ্টনে, সুপারি নারকেলের নিবিড় ছায়া ঘেরা তুমি নোয়াখালি। কিন্তু শুধু তোমাকেই বেছে নেওয়া হল কেন? কেন? কেন? কি দোষ করেছিলে তুমি? কি ছিল তোমার অপরাধ? কখনও জিজ্ঞাসা করেছ কি নিজেকে? পেয়েছ কি উত্তর? জানিনা পেয়েছ কিনা? কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র, যে কোন ছাত্র, যদি তার চোখে কোন রঙীন চশমা পরা না থাকে, তাহলে সে বলবে যে তোমার একটাই অপরাধ ছিল। তা হল, মাত্র আঠারো শতাংশ হিন্দু ছিল তোমার বুকে। বাকী সব? হিন্দু নয়। তাই তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল রহমৎ আলি, ইক্‌বাল আর জিন্নার তত্ত্বের পরীক্ষাগার হিসাবে। শব ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারি ছাত্রের গিনিপিগ হিসাবে। মাটি যাদের কাছে মা নয়, মা যাদের কাছে জমি মাত্র, সম্পত্তি মাত্র, তাই জমিকে ভাগ করার মত মাকেও ভাগ করা যায়—এই তত্ত্বেরই উদ্‌গাতা ছিলেন ঐ ত্রয়ী। আর জড়বাদ বস্তুবাদের দোহাই পেড়ে ঐ তত্ত্বকে নিঃসংকোচ নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়েছিল কমিউনিস্টরা যারা নিজেরাই আজ সারা বিশ্বে ইতিহাসের আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত।

পদ্মা-মেঘনা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে, সেইখানে সেই নোয়াখালি এখনও আছে। আজও সেখানে নদী নালার উপর নারকেল সুপারির ঘন ছায়া পড়ে। কিন্তু আজ আর সেখানে মন্দিরে মন্দিরে বাজেনা ঘন্টাধ্বনি। সন্ধ্যাবেলায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে না কূলবধুরা। ওঠে না তাদের শাঁখের আওয়াজ।

হয় না দোল-দুর্গোৎসব। শোনা যায় না মৃদঙ্গের মধুর ছন্দে কীর্তন। বসে না সংক্রান্তি-গাজনের মেলা। কিন্তু কেন? কারণ, এগুলি আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের প্রগতিশীলতা আর আমাদের অহিংসার মূল স্বরূপ। কিন্তু তাতেও আমাদের শিক্ষা হয়নি। আমাদের

প্রগতিশীলতা আর অহিংসার যূপকাষ্ঠে তারপর আমরা বলি দিয়েছি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে, পাঞ্জাবকে, বালুচিস্তানকে, উঃপঃ সীমান্ত প্রদেশকে। আর হ্যাঁ, বলি দিয়েছি সেই সিন্ধুকেও যেখানে উচ্চারিত হয়েছিল প্রথম বেদমন্ত্র। যে সিন্ধুনদের তীরে উচ্চারিত হয়েছিল 'অসদো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়' সেখানে আজ শুধু আজানের ধ্বনিই ওঠে, আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বর ফোটে সেই সিন্ধু থেকে অনেক দূরে শুধু গঙ্গার ধারে। আমাদের সর্বধর্ম সমন্বয় দিয়ে সিন্ধুকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। আমাদের ছোটবেলার প্রিয় আব্দুল চাচা পদ্মাকেও আমরা বাঁচাতে পারিনি। হায়! তবু আমাদের শিক্ষা হয় নি। ঐ চশমাগুলো আমরা এখনও খুলিনি। যে চশমাগুলো পরে পথ চললে পথ পরিস্কারভাবে দেখা যায় না। রাস্তায় হোঁচট খেতে হয়, খানাখন্দে পড়তে হয়। এমনকি গভীর-গহ্বর অতল খাদেও পতন হয়, যেখান থেকে ওঠা বড় কঠিন।

আমাদের যে শিক্ষা হয়নি তার প্রমাণ দরকার? কাশ্মীর। জ্বলন্ত রক্তঝরা কাশ্মীর। ভারতের সেই ভূস্বর্গে হিমালয়ের শুভ্র বরফে আজ রক্তের দাগ। শিক্ষা আমাদের হয়নি, তাই শুধু সিন্ধু আর পদ্মাই নয়, এইবার আমরা ঝিলম্‌কেও বিসর্জন দিতে বসেছি। শিক্ষা আমাদের হয়নি, তাই ঝিলম্ তীর নিবাসী আড়াই লক্ষ হিন্দু আজ নিজভূমে পরবাসী, উদ্বাস্তু। এরপর কী? এরপর কি তাহলে গঙ্গাও? যমুনাও? নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও? পদ্মা যাদেরকে ঠাঁই দিতে পারে নি, গঙ্গা তাদেরকে ঠাঁই দিয়েছে। সিন্ধু যাদেরকে অনেক দুঃখে কোলছাড়া করেছে, তাদেরকে ঠাঁই দিয়েছে যমুনা। ঝিলম্‌ও যাদেরকে স্থান দিতে পারল না, তাদেরও স্থান হল যমুনার ধারে। কিন্তু যমুনা নর্মদা গোদাবরী কাবেরী সব চলে গেলে?

তাই আজ আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সে শিক্ষা দিতে পারে সিন্ধু পদ্মা আর ঝিলম্। কিন্তু সিন্ধু আর ঝিলম্ অনেক দূরে। আমরা বাংলার কতিপয় ছাত্র, না ভুল বল্‌লাম, পশ্চিমবাংলার কতিপয় ছাত্র, আমরা কান পেতেছি পদ্মার বুকে। পদ্মার সে কলকল ধ্বনি কি আমাদেরকে কিছু শোনাবে? পদ্মা, তুমি কি এর আগেও কিছু বলার চেষ্টা করেছিলে আমাদেরকে? কার মুখ দিয়ে? ও! বুকের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে, গলা ছিঁড়ে রক্ত বের করতে করতে চিৎকার করছিল যে শ্যামাপ্রসাদ, তার কণ্ঠ দিয়ে? কিন্তু আমরা, প্রগতিশীল বাঙালীরা কান বন্ধ করে রেখেছিলাম, চোখ ঘুরিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের সেই বধিরতা আর আমাদের সেই অন্ধত্বের মূল্য আমাদের আগের প্রজন্ম দিয়েছে। আর, তার ফল ভোগ করছি আমরা।

তাই আজ আমরা কিছু শুনতে চাই, কিছু বুঝতে চাই। আমরা চাই কিছু শিক্ষা নিতে, পদ্মা তোমার কাছ থেকে। আর নোয়াখালি, তোমার কাছ থেকে। জানতে চাই তোমার সেই ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের রক্তঝরা দিনগুলোর কথা। যে দিনগুলো থেকে আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রেখেছে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা, প্রগতিশীলরা, দেশ বিদেশের পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী সাহিত্যিকেরা। নোয়াখালি, তোমার সে কান্নার কথা তারা আমাদের জানতে দেয়নি।

পাঞ্জাব ভাগের উপর রচিত হয়েছে অনেক 'তমস্'। কিন্তু বাংলাভাগ নিয়ে রচিত হয়নি কোন 'তমস্'। বাংলার দুর্ভাগ্যের সে প্রদোষকালের কথা আজকের প্রজন্মের কাছে তমসাচ্ছন্ন। আমরা, এই বাংলার গুটিকয় ছাত্র চাই সে তমস্‌কে ভেদ করতে। আবরণ উন্মোচন করতে চাই আমাদের সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের। সে ইতিহাস তো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে! কারণ, লেখা নেই কোথাও। আর ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ভুক্তভোগী মানুষগুলোও তো কালের অমোঘ নিয়মে একে একে বিদায় নিচ্ছে এ পৃথিবী থেকে। তাই, আমাদের বড় তাড়া, গোটা বাংলা ভাগের তত্ত্বকে নয়, তথ্যকে ধরে রাখতে। মুক্তবুদ্ধির আগামী প্রজন্ম সে তথ্যকে বিশ্লেষণ করে নিজেরাই খুঁজে বের করে নেবে তত্ত্বকে।

আমাদের সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ এই 'নোয়াখালি নোয়াখালি'। বাঙালী পাঠক-বর্গের আশীর্বাদ পেলে আমরা শীঘ্রই সম্পূর্ণ করতে পারব আমাদের প্রচেষ্টাকে। রচিত হবে বাংলার সম্পূর্ণ 'তমস্'।

কলকাতা
১২ই জানুয়ারি, ১৯৯২

প্রকাশক।

মুখবন্ধ

ওপার বাংলা আমি দেখিনি। ষাটের দশকে আমার জন্ম। এই কলকাতায়। তাই উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা ঘর হারানো মানুষের ব্যথা অনুভব করবার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু যখন বাড়িতে বাবা-কাকাদের দেশের বাড়ির কথা আলোচনা করতে শুনি, তখন বুকের কোণে কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করি। অনেক দূরের সেই না-দেখা জায়গাটা কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে ফেলে।

তবে ওঁরা চলে এলেন কেন? দাঙ্গা ওঁদের চলে আসতে বাধ্য করেছে। দাঙ্গার ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণের আশায় সেদিন দেশভাগ মেনে নেওয়া হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। মাত্র দু'অক্ষরের এই ভয়ঙ্কর শব্দটা এই উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রটাই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

'নোয়াখালি দাঙ্গা' এই লেখার বিষয়। ইচ্ছে ছিল দেশভাগের আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দাঙ্গার ঘটনাবলী নিয়ে একটা সংকলন বের করব। কিন্তু সেটা এখন সম্ভব হল না। অর্থ এবং পরিকাঠামো, দুয়েরই অভাব। এই লেখায় অনেক স্পর্শকাতর বিষয় এসেছে। কিন্তু সেগুলিকে টেনে আনতে হয়েছে ইতিহাসের কাছে নিরপরাধী থাকবার জন্য।

প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব এই বিষয়ে লিখবার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাই, সেই সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক সময় নির্ভর করতে হয়েছে সেই সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতার উপরে যাঁরা এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁদের Interview এই লেখার বড় সম্পদ।

বইটি প্রকাশে বিদ্যার্থী পরিষদ একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। একটি ছাত্রসংগঠন যে গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পারে এই বইটি তার উদাহরণ। লিখবার দায়িত্বটুকু বাদ দিলে বইটি প্রকাশের সমস্ত কৃতিত্ব এই ছাত্র সংগঠনটির। পাঠকসমাজে বইটি আদৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দেশভাগ ও দাঙ্গার ইতিহাসকে যখন সযত্নে বাঙালীর মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, তখন বিপরীত দিশায় আমাদের এই প্রচেষ্টা। প্রথম সংস্করণ বারো মাসে নিঃশেষিত হওয়ায় আমারা একটু আত্মবিশ্বাসী। এই দ্বিতীয় সংস্করণ নতুন তথ্যের সহযোগে পরিবর্ধিত।

কলকাতা

৬-১-৯৩

শান্তনু সিংহ

নভেম্বর, ছয়, ১৯৪৬।

চাঁদপুর। বাংলার অখ্যাত একটি গ্রাম।

নারকেল গাছের ছায়ায়, গ্রামের মেটে পথ দিয়ে হাঁটছিলেন মানুষটি। বৃদ্ধ। বয়সের ভারে বেশ কিছুটা নুয়ে পড়েছেন। কিন্তু পথ চলার বিরাম নেই। অনেক দূর যেতে হবে তাঁকে। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যাবেন। সকলের অভিযোগ শুনবেন। প্রয়োজনে উপদেশ দেবেন। মাত্র গত মাসে আটাত্তর বছরে পা দিলেন। তবু রেহাই নেই। 'কর্তব্য' তাঁকে সুদূর দিল্লী থেকে বাংলায় টেনে এনেছে।

অনেকদিন ধরেই বাংলায় আসবেন মনস্থির করেছিলেন। 'কলকাতা দাঙ্গা' তাঁর সমস্ত বিশ্বাসকে আঘাত করেছিল। কিন্তু আবার দাঙ্গা! মাত্র দু'মাসের মধ্যে। এবং এই বাংলায়।

কিন্তু তখন তিনি আসতে পারেননি। কারণ নিজের 'কর্তব্য' তিনি তখন বুঝে উঠতে সমর্থ হননি। তাঁর 'অন্তর আত্মা (Inner Voice) তাঁকে কোন নির্দেশ দেয়নি।

বাংলা তাঁর কাছে যেন এক ভিন্ন গ্রহ। বাংলা তাঁকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু তাঁকে মেনেও নেয়নি। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সমস্ত ভারত যখন আত্মসমর্পন করেছে, এই বাংলাই তখন এক বেয়াদপ ঘোড়ার মতো ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কোন চাবুকেই পোষ মানানো যায়নি সে ঘোড়াকে। বরং, তাঁর দুর্দমনীয় অমোঘ ব্যক্তিত্বের সাথে বাংলা সংঘাতে গেছে। তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছটায় নিজের বিদ্রোহী আত্মাকে ভুলে যায়নি।

বাইরে থেকে মানুষটির এই বিশাল ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অনুধাবন করা যায় না। বাস্তবিকই অতি সাধারণ চেহারা। কৃশ শরীর। বেঁটে গড়ন। সামঞ্জস্যহীন হাত পা। প্রকৃতি মানুষটার প্রতি সামান্য বদান্যতাও দেখায়নি। লম্বা কুলোর মতো কান। মোটা নাক। ঝুলানো ঠোঁট। আর দাঁতবিহীন ভাঙাচোরা মুখ।

কিন্তু মানুষটি ভারতবর্ষের মুকুটহীন সম্রাট। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মহাত্মা। জাতির পিতা। সাধারণ মানুষের অনুভূতি আর আবেগ বুঝবার এক অসাধারণ দৈব ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর অনুগামীদের কাছে, তিনি একাধারে যোদ্ধা সন্ন্যাসী ও মানবপ্রেমী। ইংরেজ আমলাদের কাছে গান্ধী একজন 'bogus messiah'। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের কাছে, 'He was a strange blend of great moral principles and quirky obsessions'। আপামর ভারতবাসীর কাছে, গান্ধীজী মহাত্মা, বড় আপনার মানুষ।

গান্ধীজী নোয়াখালি জেলা সফর করেছিলেন। দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলির পাশে এসেছেন তিনি। সঙ্গীসাথী পরিবৃত হয়ে নয়। মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে গান্ধীজী নোয়াখালি সফরে এসেছেন। আর তাঁর সাথে আছে তিনটি বাঁদরের সেই বিখ্যাত মূর্তি। যারা কারোর দোষ দেখে না, কারোর নিন্দা শোনে না, কারোর নিন্দা করে না। দিল্লীতেই গান্ধীজী জানিয়েছিলেন, দাঙ্গা কবলিত নোয়াখালি সফরে তিনি একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর

কাউকে সঙ্গে চান না। কারণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে এটাই তাঁর শেষ এবং চরম পরীক্ষা (last and greatest experiment)[১]।

গান্ধীজীর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু। তারপর তাঁর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরীক্ষা পূর্ণতা পেয়েছিল খিলাফত্ আন্দোলনে। অনেকেই সেদিন গান্ধীকে বারণ করেছিলেন। বার বার গান্ধীজীকে সতর্ক করা হয়েছিল এভাবে বিজাতীয় সাম্প্রদায়িক তাস খেলার বিপদ সম্পর্কে। কিন্তু গান্ধী শোনেননি। এটাই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সবসময় বিপরীতমুখী। সকলের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। তিনি সকলের সাথে চলেন না, সকলকে তাঁর সাথে চলতে হয়। তাই যখন আপামর ভারতবাসী আন্দোলন চেয়েছে, তিনি তখন মৌনী। বার বার তিনি তাঁর সত্যাগ্রহ আর অহিংস আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছেন মাঝপথে। 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করেছেন শেষ অধ্যায়ে। একলা চলাতেই তাঁর বেশী আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের ঐ গান তাঁর সবচাইতে প্রিয়, 'একলা চলো রে'।

নোয়াখালি তাঁর হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। এই শেষ পরীক্ষার সাফল্যের উপর নির্ভর করবে তাঁর আগামী দর্শনের ভিত্তি। এখানে তিনি এসেছেন তাঁর নিজের ভাষায়, 'to rekindle the lamp of neighbourliness'[২]।

এই পরীক্ষাকে সার্থক রূপ দেবার জন্য তিনি মুসলমানদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন হিন্দু ভাইদের রক্ষা করে। কিন্তু হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে তাঁর আপত্তি আছে। তাই হিন্দুদের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন বীরের মতো, পবিত্র মনে মুসলমানদের তরবারির কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। গান্ধীজীর নিজের কথায়, "It is the duty of every Hindu not to harbour any thought of revenge".

"Hindus should not die helplessly, but face death bravely and without a murmur"[৩]।

নোয়াখালিতে তাঁর এই শেষ পরীক্ষা 'last and greatest experiment' ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলমানরা সেখানে হিন্দুদের রক্ষা করেনি। হিন্দুরাও নীরবে নিজেদের মুসলমানদের তরবারির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা পালিয়ে এসেছিল। ধর্ম বাঁচাতে, মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে এবং প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। যারা পালাতে পারেনি, 'হয় কোরাণ নয় মৃত্যু' একটা তাদের বেছে নিতে হয়েছে।

কিন্তু গান্ধীজীর 'শেষ এবং মহত্তম পরীক্ষা' এখানেই শেষ হয়নি। বরং আরো মহৎ পরীক্ষার সোপান তৈরী করেছে। তাই পাঞ্জাবের ধর্ষিতা মহিলাদের তিনি উপদেশে দিয়েছেন, তারা যেন জিহ্বায় কামড় দিয়ে ধর্ষণের জ্বালা আর অপমান সহ্য করে নেয়। (His advice

---

(১) Larry Collins & Dominique Lapierre—Freedom at Midnight P-22

(২) —ঐ—22

(৩) Amrita Bazar Patrika—18-10-46.

to girls menaced with rape in Punjab had been to bite their tongue and hold their breath until they died)।[8] বাধা দেওয়া চলবে না। কোন কারণেই 'অহিংসার' বিচ্যুতি ঘটানোর পরামর্শ তিনি দিতে পারেন না।

দাতা হিসাবেও গান্ধীজী মহৎ। শুধু 'পাকিস্তান' দাবী মেনে নিয়ে তিনি তৃপ্ত নন। তাই জিন্না যখন দাবী করেছেন পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য ৫০০ মিলিয়ন টাকা দিয়ে দিতে হবে, গান্ধীজী হুমকি দিয়েছেন, ভারত সরকার ঐ টাকা পাকিস্তানকে না দিলে তিনি আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন।

'Gandhi's demand for the payment of Pakistan's 500 million rupees', 'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকা অফিসের টেলিপ্রিন্টারে বুলেটিনটা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন এক মারাঠি যুবক। 'আর নয়'। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলি। 'Let Gandhi die', গান্ধীকে মরতে হবে, নাথুরাম গডসে্ দৃপ্ত স্বরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আপ্তেকে জানিয়েছিলেন তাঁর আগামী কর্মসূচী।

গডসে্ কি গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন? না। অনেক আগেই গান্ধীর মৃত্যু পরোয়ানা লটকে দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী তো শুধু রক্ত মাংসের মানুষ নন। একজন যোদ্ধা, একজন সন্ন্যাসী। গান্ধীজী একটি মানুষের নাম নয়। গান্ধীজী একটি প্রেরণা, একটি আদর্শ। অন্ততঃ তাঁর অনুগামীদের কাছে। গান্ধীজী নিজেও দাবী করেছেন "আমার জীবনই আমার বাণী"। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্য তৈরী করতে পারেননি। যাঁরা গান্ধীবাদের নামাবলী গায়ে চাপিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ প্রকৃত গান্ধীবাদী ছিলেন না। নেহরু, আজাদ, রাজা গোপালাচারী, প্রত্যেকেই গান্ধীজীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সূর্য ছটায় নিজেদের আলোকিত করতে চেয়েছিলেন মাত্র! এটাই গান্ধীজীর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। তিনি যাঁদের বিশ্বাস করেছেন, ভালোবেসেছেন, তাঁরা কেউই তাঁর সাথে ছিলেন না। গান্ধীজীর সরল জীবনযাপন পাশ্চাত্য কেতায় মানুষ হওয়া নেহরু কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। মাংস ও মদের প্রতি নেহরুর ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। গান্ধীজী নিজেও নেহরু সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন, 'He is more English than Indian।[5] গান্ধীজীর 'সত্য প্রিয়তা' আজাদের জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গান্ধীজী তাঁর শিষ্যদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিষ্যদের ক্ষমতার কোন্দল ও স্বার্থদুষ্ট রাজনীতি থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য তাই তিনি কংগ্রেস দলকে ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

---

(৪) Larry Collins and Dominique Lapierre : Freedom at Midnight P-256

(৫) Pattabhi Sitaramayya : The History of Indian National Congress (Vol—2), P-132.

হিন্দু সমাজ থেকে একজন চলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে শুধু একটি সংখ্যা কমে গেল। বরং একজন নতুন শত্রু সৃষ্টি হল।

গুজরাটের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারটি মাত্র দু'পুরুষ আগে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। পিতামহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, বাড়িতে সেরকম আবহাওয়া কোনদিন ছিল না। তাই নাতির মানসিক বিকাশ হয়েছিল সম্পূর্ণ খোলা পরিবেশেই। ঐ নাতিটিই তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব।

বিজাতীয় ভাবাবেগ উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করবার নীতি এই মানুষটি সমর্থন করতেন না। তাই তুরস্কের খলিফার সমর্থনে গান্ধীজীর ডাকা খিলাফত আন্দোলন সমর্থন তিনি করেননি। বরং আইনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 'a nationalist first, nationalist second and nationalist third'। দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা তাঁকে লোকমান্য তিলকের কাছে নিয়ে এসেছিল। তিলকের হয়ে বোম্বে হাইকোর্টে তিনি যে ঐতিহাসিক মামলা লড়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি মুক্ত এবং 'আসুরিক' ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এই মানুষটির মধ্যে অনেকেই আশার আলো দেখেছিলেন। মহামতি গোখলে মানুষটির উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং উচ্চাশা স্থাপন করে লিখেছিলেন, 'he has true stuff in him, and that freedom from all sectarian prejudice which will make him the best ambassador of Hindu-Muslim unity"।[৬] এমনকি মুসলীম লীগে যোগ দেওয়ার পরও তাঁর দেশপ্রেমের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা বিকৃতি ঘটেনি। সরোজিনী নাইডু এই ভারতীয় সাহেবটির মুসলীম লীগে যোগদান সম্পর্কে লিখেছেন, "His two sponsors were required to make a solemn preliminary covenant that loyality to the Muslim League and the muslim interest would in no way and at no time imply even the shadow of disloyalty to the larger national cause, to which his life was dedicated."[৭]

পারিবারিক জীবনে একা, সামাজিক জীবনে বন্ধুহীন, চরম 'নিয়মতান্ত্রিক' (constitutionalist) মহম্মদ আলি জিন্না ইসলাম সম্পর্কে কোনদিনই উৎসাহী ছিলেন না। কোরাণ তিনি কখনও পড়ে দেখেননি। এম. এল. এ. হিসাবে শপথ নেওয়ার সময় কোরাণ ছুঁতে হয়েছে বটে, কিন্তু কোরাণের ভেতর কী আছে তা জানবার ইচ্ছা জিন্নার কোনদিন হয়নি। বরং ইসলাম তাঁর কাছে ছিল 'nonsense'।[৮] মসজিদে গিয়ে জিন্না নামাজ পড়েছেন বলে জানা

---

(৬) V. B. Kulkarni : Inida and Pakistan, P-278-9

(৭) ঐ, P-212-3

(৮) ঐ, P-275

যায় না। বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নিজেকে দেখতে ঘৃণা বোধ করতেন এই কেতাদুরস্ত ব্যারিস্টার। ডঃ আম্বেদকর জানিয়েছেন, "he (Jinnah) was never known to be a very devout, pious or a professing Muslim. Besides kissing the Holy Quran as and when he was sworn in as an M. L. A., he does not appear to have bothered much about its contents or its special tenets. It is doubtful if he frequented any mosque either out of curiosity or religious fervour. Mr. Jinnah was never found in the midst of Muslim mass congregations, religious, or political."[৯]

মদ্যপান ছিল জিন্নার অবসর কাটানোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনোদন। ইসলামে নিষিদ্ধ সূরার মধ্যে তিনি 'বেহেস্তে'র সুখ উপভোগ করতেন। মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে অপবিত্র শুয়োরের মাংস ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্যগুলির অন্যতম।[১০] মদ এবং শুয়োরের মাংস রোজই শোভা পেত জিন্নার খাবার টেবিলে। জিন্না উর্দু ফারসী ভাষা জানতেন না। ভারতীয় মুসলমানদের নিজের বন্ধু ভাবতে তিনি শিউরে উঠতেন। কিন্তু তবু মহম্মদ আলি জিন্না হয়ে উঠলেন দেশের আট কোটি মুসলমানের সর্বসম্মত নেতা।

১৯৩৭ সালের রাজ্য আইনসভা (বিধানসভা) নির্বাচন ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেওয়ার মুহূর্ত। জিন্না মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণায় তাঁর তখনও অবিচল বিশ্বাস ছিল। এমনকি, ১৯৩৩ সালে জিন্না ইংল্যান্ড সফরে গেলে, সেখানে পাকিস্তান পরিকল্পনার জনক রহমত আলি তাঁকে 'পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে'র আন্দোলন করবার পরামর্শ দিলে জিন্না সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পাকিস্তান তাঁর কাছে ছিল, "an impossible dream".[১১]

এই নির্বাচনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। তা হল, জিন্নার জননেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রথম পরীক্ষা। কারণ, জিন্না লীগের নেতৃত্বে আসবার পর সেটা ছিল প্রথম নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনে মুসলীম লীগ ব্যর্থ হল। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধুর মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিতেও মুসলীম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। বাংলায় ক্ষমতা দখল করল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। পাঞ্জাবে ক্ষমতায় এল পাকিস্তান আন্দোলনের চরম বিরোধী স্যার খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নিস্ট পার্টি। সিন্ধু প্রদেশে রাজ্য আইনসভার তিরিশটি আসনের মধ্যে লীগের ভাগ্যে জুটল মাত্র তিনটি আসন।[১২]

লীগের এই পরাজয় জিন্না রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করলেন না। বরং ব্যক্তিগত অপমানের

---

(৯) Ambedkar : Pakistan or the Partition of India. P-405

(১০) Larry Collins & Dominique Lapierre : Freedom at Midnight. P-102

(১১) ঐ, P-102

(১২) V. P. Menon : Transfer, of Power, P-55

পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবার শুরু হল তীব্র হিন্দু বিরোধী প্রচার। মাত্র কয়েকদিন আগেও যে জিন্না নিজের পরিচয় দিতেন 'a nationalist first' বলে, এখন তিনিই দাবী করলেন, "কয়েক শতক আগে যেদিন প্রথম হিন্দুটি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল সেইদিনই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।" (Pakistan was born the day when the first Hindu was converted to Islam centuries ago)।

২৩শে মার্চ, ১৯৪০, মুসলীম লীগের লাহোর সম্মেলনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হল। মহম্মদ আলি জিন্না ব্যাখ্যা করলেন, "ভারতবর্ষের সমস্যা সম্প্রদায়গত নয়, বরং জাতিগত! এটা খুবই দুঃখের যে হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুত্বের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছেন না! ইসলাম এবং হিন্দুত্ব শুধুমাত্র আলাদা ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জাতি সত্ত্বা। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথক ইতিহাস থেকে প্রেরণা পায়। এদের একজনের মহাপুরুষ অন্যজনের শত্রু।...মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়। মুসলমান একটা জাতি। জাতি গঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের আছে। তাই তাদের অবশ্যই নিজের বাসভূমির অধিকার আছে ("Mussalmans are not a minority... Mussalmans are a nation according to any definition of a nation, and they must have their own homeland, their territory and their state").[১৩]

কিন্তু জিন্না ভালোভাবেই জানতেন, যতই হৈচৈ করা হোক না কেন, মুসলীম লীগের একার পক্ষে কখনোই পাকিস্তান আদায় করা সম্ভব নয়। তাই 'হাসতে হাসতে' পাকিস্তান পেয়ে অবাক জিন্না তাঁর A. D. C.-র কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, "আমি কখনোই আমার জীবনে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব ভাবিনি।" (I never thought it would happen, I never expected to see Pakistan in my lifetime)[১৪]

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের বে-হিসাবী নেতারাই জিন্নাকে পাকিস্তানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী জিন্নার সাথে বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে জিন্নাকে 'কায়েদ-ই-আজম' বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু গুজরাটি রীতি অনুযায়ী তাঁকে 'জিন্নাভাই' বলে সম্বোধিত করবার কথা। জিন্না কিন্তু গান্ধীজীকে 'মিঃ গান্ধী' বলেই সম্বোধন করেছিলেন। ঐ সময় গান্ধীজী মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে করুণা ভিক্ষা করেন, "আমি আপনার বা ইসলামের শত্রু নই। আমি আপনাদের দীন সেবক (Servant) মাত্র। আমাকে দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না।"[১৫]

গান্ধীজীর এই অপমানকর আত্মসমর্পণে উৎফুল্ল জিন্না লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিকে জানিয়েছিলেন, "At last—and is good and conducive to further

---

(১৩) V. P. Menon : Transfer, of Power, P-82

(১৪) Leonard Moseley : Last Days of British Raj, P-274

(১৫) V. P. Menon : Transfer, of Power, P-162

progress... Mr. Gandhi has, at any rate in his personal capacity; accepted the principles of partition or division of India."[১৬]

১৯৪৫-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার (পার্লামেন্ট) নির্বাচন হল। মুসলীম লীগ তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের সমর্থনে 'মুসলমান জাতি'কে ভোট দিতে আহ্বান জানাল (Muslim League fought on the single issue of Pakistan)[১৭]। কংগ্রেস নির্বাচনে নেমেছিল 'স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত'কে ইস্যু করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার প্রধান বীর সাভারকর জাতিকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্বর পক্ষে মুসলীম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই কংগ্রেসকে একটি ভোট মানেই পাকিস্তানের সপক্ষে একটি ভোট।

কিন্তু সাভারকরের এই 'সঠিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ' সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হল। হিন্দুদের ভোট পেল কংগ্রেস। কিন্তু মুসলীম সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের মুসলমান প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। লীগ ৮৬.৬% মুসলমান ভোট পেয়ে সংরক্ষিত ৭৯টি আসনের মধ্যে ৭৬টি আসনে জয়লাভ করল, কংগ্রেসের ভাগ্যে জুটল মাত্র ৩টি মুসলিম আসন।[১৮]

মুসলীম আসনগুলিতে কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জিন্না দাবী করলেন, "মুসলমানরা কংগ্রেসের সাথে আছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা। আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৭৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের মুসলমান প্রার্থীরা মাত্র ৩টি আসনে জয়লাভ করতে পেরেছে, এবং ঐ কুলাঙ্গাররা (যে মুসলমানরা কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছেন) সর্বত্রই পদাঘাত পাচ্ছেন (kicked out anywhere)"[১৯]

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ইংল্যান্ডের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ক্যাবিনেট মিশনের কথা ঘোষণা করলেন। ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস, উভয় পক্ষকেই আমন্ত্রণ জানালেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। মহম্মদ আলি জিন্না 'হিন্দু কংগ্রেসে'র 'মুসলমান' প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হলেন না। কারণ, 'Hindus were "enemies", he (Jinnah) said, but non-League Muslims were "taritors". He could not deal with "traitors". (জিন্না বললেন, হিন্দুরা হচ্ছে "শত্রু", কিন্তু অ-লীগপন্থী মুসলমানরা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক এবং তিনি বিশ্বাসঘাতকদের

---

(১৬) Madan Gopal : Sir Chhotu Ram, P-134

(১৭) R. C. Majumdar : History of the Freedom Movement in India, Vol-3, P-747

(১৮) ঐ P-751

(১৯) The Statesman : 29-7-46

সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবেন না।)[২০]

দুঃখজনক সন্দেহ নেই, কংগ্রেস জিন্নার এই দাবীর কাছে মাথা নিচু করে, 'হিন্দু' নেহরুকে সভাপতির প্রতিনিধি নিয়োগ করল।[২১] জিন্না আরো দাবী করলেন, কেন্দ্রের আসন্ন অস্থায়ী মন্ত্রীসভার 'হিন্দু কংগ্রেসে'র কোন মুসলমান প্রতিনিধি থাকা চলবে না। মৌলানা আজাদ পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির অজ্ঞাতসারে জিন্নার এই দাবী স্বীকার করে নিয়ে ভাইসরয়কে চিঠি দিলেন। পরে স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ গান্ধীজীকে ঐ চিঠিটি দেখালে আজাদ তাঁর 'হাতের লেখা' চিঠির কথা বেমালুম অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর সর্বসময়ের সঙ্গী সুধীর ঘোষ তাঁর "Gandhiji's Emissary" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ Gandhiji asked Maulana Saheb a straight question whether he had written any letter to the Viceroy about the negotiations that were going on. The Maulana flatly denied having written any letter at all. He did this while the letter in original was lying in front of Gandhiji on his little desk at a distance of two or three yards from the spot where Maulana Saheb was sitting...what deeply upset Gandhiji was that a life long colleague to whom he had such unflinching loyalty could be so untruthful... ."

এদিকে ৬ই জুলাই বোম্বেতে এক প্রেস কনফারেন্সে নেহরু ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। জিন্নার পক্ষে কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ক্ষিপ্ত জিন্না তাঁর 'নিয়মতান্ত্রিক' (constitutionalist) ইমেজ ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন। শুরু হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (Direct Action) প্রস্তুতি।

রহমান আলী আগের দিন রাতেই তার লোকজন নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। খিদিরপুর, কলুটোলা, রাজাবাজার, ধর্মতলা, পার্কসার্কাস, তালতলা; রহমানের লোকজন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আগেই রহমান আলী সমস্ত 'হিসাব-নিকাশ' পরিষ্কার করে নিয়েছিল। লুটের মালের কোনো বখরা কাউকে দিতে হবে না। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ—না, পুলিশ এ সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

বলা হল, ১৬ই আগস্ট, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র দিন মুসলীম লীগের কর্মীরা জায়গায় জায়গায় মিটিং করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগঠিত করবে। বাংলায় অবশ্য ১৬ তারিখ লীগের তরফ থেকে বনধ্ ডাকা হল। সুরাবর্দী তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (Premier)। তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলীম লীগ সরকার ঐ দিন বাংলায় 'ছুটির দিন' ঘোষণা করল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র প্রতি 'প্রত্যক্ষ' সমর্থন আর কি! রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হৈচৈ করলেন

---

(২০) J. B. Kripalani : Gandhi—His Life and Thought. P-235

(২১) The Statesman : 27-7-46

বটে, কিন্তু রাজ্য আইনসভার চার দেওয়ালের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বা বাংলা বন্‌ধের বিরুদ্ধে বাংলার জনচেতনা সংগঠিত করবার কোন প্রয়াস তাঁরা করলেন না। একমাত্র হিন্দু মহাসভা জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করল, কিন্তু কংগ্রেসের মতো ব্যাপক জনসমর্থন তাদের ছিল না। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হবে, জিন্না ও লীগের উপর এই অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেই গান্ধীজী তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। নেহরু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'বিদ্রোহ' ঢং-এ যাঁরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তাদের প্রতিদিনের মতোই হাট, বাজার, অফিস করবার পরামর্শ দিলেন।

লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' নিয়ে সবচেয়ে অদ্ভুত বক্তব্য রাখা হল কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে।

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদে পার্টির নেতা জ্যোতি বসু (বর্তমানে পঃ বঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) এক প্রচারবিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, "মূলতঃ আমাদের পার্টির চেষ্টা হবে মুসলীম লীগের ডাকা বনধ্-এর দিন রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা। তাই যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমরা বনধ্ সমর্থন করব এবং যেখানে প্রয়োজন নয় সেখানে বন্‌ধের বিপক্ষে থাকব। (with a strike where necessary and without a strike where necessary)[২২]

কী বিস্ময়কর সুবিধাবাদ! হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কম্যুনিস্টরা লীগের ডাকা বাংলা বনধের বিরোধীতা করবেন। অপরদিকে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বনধ্‌কে সমর্থন জানানো হবে।

১৬ তারিখ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হাওড়া থেকে আসা রহমান আলীর লোকজন হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুঠ, খুন, ধর্ষণে মেতে উঠল কলকাতা। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হল। ধর্ষিতা এবং অপহৃতা মহিলাদের কোন হিসাব পাওয়া গেল না। কলকাতার এখানে সেখানে জমে উঠল লাশের পাহাড়। দাঙ্গার বীভৎসতা দেখে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ব্রিটিশ সংবাদদাতা কিম ক্রিস্টেন লিখলেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আমার স্নায়ু (nerve) যথেষ্ট শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধও এত পৈশাচিক নয়। এ এক মধ্যযুগীয় বর্বর উন্মাদনা। এবং এটাকে পৈশাচিক রূপ দেওয়া হয়েছিল।"[২৩]

কলকাতার মেয়র সেরিফ খান সক্রিয়ভাবে এই দাঙ্গা পরিচালনা করলেন।[২৪] প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে এই দাঙ্গার মদত যোগাল। আগেই পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছিল। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছিল মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর হাতে। তাঁর নির্দেশে

(২২) Amrita Bazar Patrika : 14-8-46

(২৩) J. B. Kripalani : Gandhi—His Life and Thought. P-253

(২৪) ঐ

চব্বিশটি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সবকটি থেকেই হিন্দু পুলিশ অফিসার সরিয়ে তাদের জায়গায় বাইশটিতে মুসলমান অফিসার এবং দুটিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল।[২৫] পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল। সরকার কোন রকম গণ্ডগোলের কথাই অস্বীকার করলেন। এমনকি, বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর এফ. ব্যারোজ তাঁর অফিসের চেম্বারে বসে ঘোষণা করলেন যে তিনি দাঙ্গার কোন খবরই শোনেননি (Seeing no evilhearing no evil)।

প্রশাসন হিন্দুদের নিরাপত্তা দেবে না বুঝতে পেরে সতেরো তারিখ বিকাল থেকে হিন্দু ও শিখরা যৌথভাবে অঞ্চলে অঞ্চলে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলল। বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান সমাজবিরোধীদের উপর পাল্টা আঘাত নামিয়ে আনা হল। কিন্তু বোর আর সরকার নীরব দর্শক রইল না। পুলিশ ও মিলিটারিকে প্রতিরোধ বাহিনীগুলির উপর লেলিয়ে দেওয়া হল।[২৬] কলকাতায় দাঙ্গায় নিহত হল পাঁচ হাজার মানুষ, আহতের সংখ্যা পনের হাজার ছাড়িয়ে গেল।

কিন্তু 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র নামে যে ঠিক এই রকমই একটা হিন্দু নিধন যজ্ঞের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, মহম্মদ আলি জিন্না তা কখনও গোপন রাখেননি। ২৭-২৮ জুলাই, ১৯৪৬, বোম্বেতে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের জাতীয় সভায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (Direct Action) কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। জিন্না ঐ সভায় ঘোষণা করেছিলেন ''পাকিস্তান বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুর সাথেই মুসলমান জাতি ('Muslim Nation', জিন্না মুসলমানদের একটি আলাদা জাতি বলে দাবী করতেন) কোন প্রকার আপোস করবে না। এখন সময় হয়েছে সেই দাবী আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া'' (Now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action)।[২৭]

কেন এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র প্রয়োজন? জিন্না ব্যাখ্যা করলেন, "to achieve Pakistan and assert our just right and to vindicate our honour and to get rid of the present slavery under British and contemplated future of the caste Hindu domination."[২৮]

এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র গতিপ্রকৃতি কী হবে? জিন্না দাবী করলেন, ''আমরা আজ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সবসময়ই আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই (Constitutional methods) আমাদের দাবী জানিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ সময় এসেছে এই নিয়মতান্ত্রিক পথকে বিদায় জানাবার (good bye to

---

(২৫) J. B. Kripalani : Gandhi—His Life and Thought. P-253

(২৬) ঐ P-254

(২৭) Text of the Resolution, Bombay, 1946

(২৮) ঐ

constitutional methods)। আমরা এতদিন যে দুটো 'পার্টি'র কাছে দাবী জানিয়ে এসেছি, তারা দু'জনেই আমাদের বুকে পিস্তল চেপে ধরেছে। একজন দেখিয়েছে মেশিনগান আর ক্ষমতার আস্ফালন, অন্যজন দেখিয়েছে সত্যাগ্রহের ভয়। কিন্তু আজ আমাদের কাছেও পিস্তল আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতে সমর্থ। (we also have a pistol and are in position to use it)[২৯]

এই 'পিস্তল' কলকাতায় পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা হল। কিন্তু বারুদের গন্ধ মিলিয়ে গেল অচিরেই। বাঙালী হিন্দুর 'ইতিহাস বিস্মৃত' মানসিকতার উপর 'কলকাতা দাঙ্গা' কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করল না। এই রকম একটা জঘন্য অপকর্ম করবার পরও বাংলার মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হল না। কংগ্রেস মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করল না। দিল্লীর মসনদ দখলের স্বপ্ন তখন তাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়েছিল। "While Calcutta was the scene of an unprecedented holocaust Nehru was busy negotiating with the Viceroy about the interim Government."[৩০] (কলকাতায় যখন নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন নেহরু তাঁর অন্তবর্তীকালীন সরকার নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।)

অঞ্চলে অঞ্চলে হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বাঙালীর উন্নাসিক মানসিকতার কাছে তাঁর আহ্বান পরাভূত হল।

কিন্তু 'কলকাতা দাঙ্গা'র যন্ত্রণা 'মুসলমান জাতি'র পক্ষে সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব হল না। মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করবার সাহস দেখাতে পারে—এই অপমান মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য শুরু হল নতুন প্রস্তুতি।

মুসলমান নেতারা এই বার প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন যেন কলকাতার পুনরাবৃত্তি না হয়। অর্থাৎ প্রতিরোধ তো দূরের কথা, হিন্দুরা পালিয়ে যাওয়ারও কোন সুযোগ যেন না পায়। আর এর জন্য বেছে নেওয়া হল কলকাতা থেকে দূরে, নদীনালা বেষ্টিত, তাল সুপারির ছায়ায় ঘেরা, শান্ত শ্যামল নোয়াখালি। পূর্ববাংলার এই জেলাটির একটি আবশ্যকীয় গুণ ছিল। জেলাটি হিন্দু সংখ্যালঘু। জনসংখ্যার মাত্র ১৮·৬% হিন্দু। বাকী ৮১·৪% মুসলমান। তাই কলকাতায় ব্যর্থতার পর পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্ট এবার এখানেই শুরু হল। শুরু হল 'অপারেশন নোয়াখালি'।

---

(২৯) Pirzada—Foundation of Pakistan. P-559-60

(৩০) R. C. Majumdar : History of the Freedom Movement. Vol-3, P-789

"শুনছেন নি ও মিঞা ভাই
গোলাম সরোয়ার মিঞার মতন
খাট্টি মাইনস্ আর নাই।"

গোলাম সরোয়ারকে নিয়ে সেদিন এ রকম অনেক ছড়া ঘুরছিল নোয়াখালির গ্রামে-গঞ্জে। মুসলিম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. সাহাপুর স্কুলের সভাপতি গোলাম সরোয়ার তখন নোয়াখালির অবিসম্বদিত নেতা। সাধারণ মানুষের চোখের মণি, যুব সমাজের প্রেরণা। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার উত্তাপে উদ্বেলিত মুসলমানরা সেদিন গোলাম সরোয়ারকে ছড়া বেঁধে অভিনন্দন জানিয়েছিল নোয়াখালি জেলার গ্রামে-গঞ্জে।

'কলকাতা দাঙ্গা'র প্রতিশোধ নিতে নোয়াখালির হিন্দুদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনতে হবে—এই পরিকল্পনা ছিল গোলাম সরোয়ারের মস্তিষ্ক প্রসূত। এই পরিকল্পনা সার্থক রূপায়ণে গোলাম সরোয়ারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল স্কুলের শিক্ষক, মৌলভি, এমনকি ইউনিয়ন সভাপতিরাও (Gulam received support from local school-masters, moulavis and the union Presidents)।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে নোয়াখালিতে শুরু হয়েছিল লাগাতার হিন্দু-বিদ্বেষী প্রচার। হিন্দুদের দোকান বয়কট করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল মুসলমানদের কাছে। মুসলীম ন্যাশনাল গার্ড-এর ভলান্টিয়াররা হিন্দু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত যেন কোন মুসলমান সেখান থেকে জিনিস না কেনে। শত প্রয়োজনেও কোন মুসলমান হিন্দুর দোকান থেকে জিনিস কিনলে তাকে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস করতে হত। সরকার তার গোপন রিপোর্টে জানিয়েছিল, "Muslims buying goods from Hindus were abused and beaten."[৩১]

কোর্টে গিয়ে মুসলমানদের কাছে আহ্বান জানানো হত যেন কোনভাবেই তারা হিন্দু উকিলের কাছে না যায়।

নোয়াখালিতে বড় বড় পানের মৌজা ছিল। হাটের দিন লীগের কর্মীরা হিন্দুদের পানের আড়তগুলির সামনে পিকেটিং করে থাকত যেন কোনভাবেই হিন্দুরা পান বিক্রি করতে না পারে।

এভাবে হিন্দুদের ভাতে মারার সাথে সাথে শুরু হয়েছিল তাদের জীবনের সামান্যতম নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেওয়া। বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি ডাকাতি করা, প্রকাশ্য স্থানে গরু জবাই করা ও সেই মাংস হিন্দুদের বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা—এ সবই ছিল গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে লীগের কাফের শূন্য নোয়াখালি তৈরীর পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভাতেও বিভিন্ন বক্তা নোয়াখালির হিন্দুদের

(৩১) Burrows to Pethick Lawerence, 17 October, 1946, Transfer of Power. Vol-VIII, Document 472, P-743.

নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন "Widespread reports of Hindus deprived of their valuables while travelling in boats, of Hindu houses burgled, of cows sacrificed in public places, of Hindu shops looted and temples and idols desecrated."[৩২]

হিন্দুদের জীবন কিভাবে বিভীষিকার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তা স্মরণ করতে এখনও আঁৎকে ওঠেন বেগমগঞ্জ থানার পাঁচ গাঁও-এর মানুষ। "আমাদের পাশেই একটা ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। ওরা ছিল চার ভাই। কুরবানির দিন ওদের ঠাকুর মন্দিরের সামনে গরু কাটা হল, তারপর ঝুড়ি করে ওদের চার ভাইয়ের ঘরেই মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওরা তো এসব দেখে একেবারে আঁৎকে উঠেছে আর কী! অনেকে ঘৃণায় বমি করতে শুরু করল। ব্যাস, আর যায় কোথায়। গ্রামের সমস্ত মুসলমান ওদের বাড়ি ঘিরে ধরল। বলল, 'শালা মালাউন, হারামজাদা, আমাদের খোদার প্রসাদ অপমান করলি!' বিচার বসল, ওদের শাস্তি হল। বাড়ির সব পুরুষকে নাকে খৎ দিতে হল, জরিমানা ধার্য্য হল ২৫০ টাকা।"

নাউলির গোবিন্দপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ সজল চোখে জানিয়েছেন কী বীভৎস মানসিক অত্যাচার তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। "আমরা দু-তিন জন হিন্দু এক সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছি দেখলেই মুসলমানরা আমাদের টিটকারী দিয়ে ছড়া কাটত ঃ

"ওহে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁশরি
দেখ, বর্ণহিন্দু কথা কয়
হাত ঠারি, মুখ ঠারি।"

নিজের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে আজকের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত জনৈক আইন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, "আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। অবাক হয়ে দেখলাম যারা আমাদের বাড়িতে কাজ করত তারা হঠাৎ আমাদের 'তুই' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করল। কলকাতা থেকে কোন আত্মীয়-স্বজন গেলে বলত, 'কিরে, কলকাতায় ক'টা মুসলমান মারলি'। ওরা ইচ্ছা করেই 'তুই' শব্দটা ব্যবহার করত।"

সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে লেখা উপরেরর এই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে ক্ষীণতম সত্যের অপলাপ নেই। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত Bengal Press Advisory Committee[৩৩]-র রিপোর্টেও হিন্দুদের এই করুণ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ঐ সমস্ত নথিপত্র দেখলে বোঝা যায়, নোয়াখালি 'দাঙ্গা'র মাটি তৈরী করার জন্য কী ধুরন্ধর পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

B. P., A. C. নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন থানায় জমা দেওয়া 'ডায়েরী' ঘেঁটে যে তথ্য

---

(৩২) G. D. Khosla : Stern Reckoning : A Survey of the Events before and following the Partition of India. P-69-70

(৩৩) Bengal Press Advisory Committee Report, 1946 (Oct.)

বের করেছিল তাতে জানা যায় যে হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই স্থানীয় প্রশাসনকে দাঙ্গার পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত।

থানায় নথিভুক্ত কিছু 'ডায়েরী'র কথা এখানে উল্লেখ করা হল। নিরাপত্তার কারণে ডায়েরীদাতাদের নাম সেদিন B. P., A. C. প্রকাশ করেনি। ফলে এখানেও কোন নাম প্রকাশ করা গেল না।

রামগঞ্জ থানায় ১৩-৯-৪৬ এ জনৈক গ্রামবাসী যে 'ডায়েরী' করেন তা এইরকম, "রেশন নিয়ে ফিরবার পথে একদল লোক আমায় আক্রমণ করে। কিন্তু আমার গ্রামের লোক ঐ সময় চলে এলে আমি বেঁচে যাই। কিন্তু যাবার আগে ওরা আমাদের এই বলে শাসায় যে কলকাতার বদলা ওরা নেবেই। আমরা কেউ নিস্তার পাব না।"[৩৪]

১০-৯-৪৬ এ নোয়াখালির জেলাশাসককে লেখা একটি আবেদন পত্রে কিছু গ্রামবাসী জানিয়েছিলেন, "আমরা (হিন্দুরা) এখানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। 'কলকাতা দাঙ্গার বদলা চাই' হুঙ্কার দিয়ে রোজই এখানে মিছিল বের করা হচ্ছে। আমাদের দোকান থেকে জিনিস না কিনবার জন্য বলা হচ্ছে। আমাদের 'জবাই করা হবে' বলে শাসানো হচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হোক। আমরা, গ্রামবাসীরা গ্রামে পুলিশ রাখবার খরচ বহন করব!"

১৮-৯-৪৬ এ রকমই একটি ডায়েরীতে অভিযোগ করা হয়েছে, "আমাদের জীবন এখানে সুতোর উপর ঝুলছে। আমাদের সবাইকে খুন করা হবে বলে শাসানো হচ্ছে। ওরা বলছে, শুধু হাই কম্যান্ডের নির্দেশ এখনও পাওয়া যায়নি, তাই আমাদের কোতল করা হচ্ছে না।"

শুধু হুমকি দিয়েই হিন্দুমনকে ভয়ক্লিষ্ট করে তোলা হয়নি। হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানগুলি অপবিত্র করারও ডাক দেওয়া হয়েছিল। ১০-৯-৪৬ এ পুলিশের কাছে জমা দেওয়া একটি অভিযোগে দেখা যায় যে গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে মুসলীম লীগের একটি মিছিল সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করবার পর জনৈক গ্রামবাসীর দেবস্থান অপবিত্র করে।

এভাবে একদিকে যখন লাগাতার ত্রাসের সৃষ্টি করে হিন্দুদের মনস্তাত্বিকভাবে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছিল, অন্যদিকে তখন মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারকে সম্বল করে। মৌলভিরা গ্রামেগঞ্জে এমনও প্রচার করেছিল যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে হবে।[৩৫]

---

(৩৪) ঐ (৩৪ক) ঐ (৩৪খ) ঐ (৩৪গ) ঐ

(৩৫) McInery Papers. 1976

দাঙ্গার পরিকল্পনা এত ব্যাপক ছিল যে বাংলার বাইরে থেকে অবাঙালী পাঠান ও পেশোয়ারী মুসলমানদের এনে নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে জড়ো করা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় রিপোর্ট করা হয়েছিল, "Many of the hooligans in Noakhali appeared to be from outside."[৩৬]

নোয়াখালি থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে আসা যে মানুষগুলি সেদিন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরই একজন জনৈক ফণিভূষণ শূর জানিয়েছিলেন, ''আমাদের গ্রামে (হাজিগঞ্জ) দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছে পেশোয়ারী মুসলমানরা। ওদের প্রত্যেকের হাতে ছিল লম্বা তরোয়াল। ওদের নির্দেশেই খুন, লুঠ, ধর্ষণ, অপহরণ সংগঠিত হয়েছিল।''[৩৭]

এখানেই শেষ নয়। দাঙ্গার এই নিখুঁত পরিকল্পনাকে আরো নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করবার উদ্দেশ্যে নোয়াখালির দাঙ্গা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান সৈন্যদের উপর। সেনাবাহিনীর রণকৌশলের সমস্ত শিক্ষা নোয়াখালির হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লীগ নেতারা কলকাতা দাঙ্গার চরম প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁদের তূনীরের সমস্ত অস্ত্রই তাঁরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চাইলেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি ঘুরে এসে সাংবাদিকরা জানিয়েছিলেন, "the heads of miscreants were Ex-servicemen and they organised the raids in military fashion...The people knew how to dig up road and cut communication."[৩৮]

অর্থাৎ পেশাদারিত্বের সার্থক প্রয়োগ করা হল নোয়াখালির দাঙ্গায়। পথের জায়গায় জায়গায় গর্ত খুঁড়ে, কিংবা খাল এবং নদীগুলিতে নৌকার সাহায্যে ব্যারিকেড তৈরী করে আক্রান্ত হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 'হিন্দুরা যেন পালিয়ে যেতে না পারে তাই রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, জলপথে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং যেসব জায়গা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ রয়েছে, সেখানে সশস্ত্র দুস্কৃতিকারীরা পাহারা দিচ্ছিল।''[৩৯] বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার প্রধান সুরাবাদী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "Some canals in the affected areas had been damaged and roads cut."[৪০]

এভাবে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পর, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬, নোয়াখালি দাঙ্গার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটল। ভয়াবহ সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হল হিন্দুদের উপর। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার

---

(৩৬) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

(৩৭) ঐ 22-10-46

(৩৮) Amrita Bazar Patrika. 19-10-46

(৩৯) V. P. Menon : Transfer of Power, P-322

(৪০) The Statesman : 17-10-46

বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুন, লুঠ, ধর্ষণ ও অপহরণ চলল বাধাহীনভাবে। প্রশাসন জেগে ঘুমিয়ে রইল। অসহায় আতঙ্কিত হিন্দুরা পালাতে শুরু করল প্রাণ বাঁচাতে।

দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১০ই অক্টোবর। কিন্তু রাজ্য সরকার দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশ করল ১৫ই অক্টোবর। অর্থাৎ, দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে, এবং সেটাও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে।

'নোয়াখালি দাঙ্গা' সম্পর্কে স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় প্রাথমিক রিপোর্ট লেখা হল, "বাংলা সরকার প্রাথমিক খবরে জানতে পেরেছে যে নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা শুরু হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করছে। গত বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ '১০ই অক্টোবর থেকে এই খুন ও লুঠ শুরু হয়। জোর করে ধর্মান্তরকরণ এবং ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করবার খবরও এসে পৌঁচেছে। ব্যাপক হত্যালীলা চলছে। জীবন্ত মানুষকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জেলার বার কাউন্সিলের সভাপতি ও তাঁর পরিবারের সবাইকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।"[৪১]

সরকারের এই খবর black out করবার নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল, "নোয়াখালি থেকে রক্ত হিম করা খবর আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁচেছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের বক্তব্য থেকেই এটা পরিস্কার যে, এই দাঙ্গা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুসারেই গত বৃহস্পতিবার থেকে খুন ও লুঠ শুরু হয়েছে। কিন্তু এটা ভাবতে অবাক লাগছে যে, এই ধরনের এক অভূতপূর্ব দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশিত হল পনেরই অক্টোবর, অর্থাৎ দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচদিন পরে। দুঃখজনকভাবে, অথবা বলা যেতে পারে রহস্যজনকভাবে, বাংলা সরকারের 'Director of Publicity' দ্বারা প্রকাশিত 'press note' এত সংক্ষিপ্ত (Laconic) ছিল যে এর থেকে কোনভাবেই দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব নয়।

"কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচদিন এভাবে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারের রাখবার কৈফিয়ৎ কে দেবে? আর যাই হোক, নোয়াখালি নিশ্চয়ই পেশোয়ার বা কুইট্টা নয়। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। তবে কি রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে এই ক'দিন কোন সংবাদ পায়নি। এবং যদি পেয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার এই ক'দিন কী করেছে?"[৪২]

শুধু খুন বা লুঠ 'নোয়াখালি দাঙ্গা'র মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাই যদি হত তবে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে মোল্লা বা মৌলভির দল হিন্দু গ্রামগুলি আক্রমণ করতে যেত না। এ ছিল ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা কী হবে তার একটা ছোট্ট প্রদর্শন। জেলার সমস্ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে নোয়াখালিকে দার-উল্-ইসলামে পরিণত করতে চেয়েছিলেন লীগের নেতৃবৃন্দ।

---

(৪১) The Statesman : 15-10-46

(৪২) Amrita Bazar Patrika. 17-10-46

তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এই বল্গাহীন সন্ত্রাসের। তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত 'নোয়াখালি দাঙ্গা'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "that the apparent object behind the disturbances was to make the entire district exclusive to the majority community (Muslim)।"[৪৩]

নোয়াখালিকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করবার জন্য সেখানে একদিকে যেমন খুন-লুঠ-সন্ত্রাসের বল্গাহীন রাজত্ব কায়েম করা হল, অন্যদিকে তেমনি বারো থেকে বিয়াল্লিশ অসংখ্য হিন্দু নারী ধর্ষণ বা অপহরণের শিকার হল। ভাগ্যবতী যে ক'জন পালিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের চোখেও ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। 'হয় কোরাণ নয় মৃত্যু' নীতি অবলম্বন করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। এমনকি, তাদের দিয়ে গো-হত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং সেই গোমাংস তাদের খাওয়ানো হল। হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি অপবিত্র করা হল। দাঙ্গা 'রিপোর্ট' করতে গিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লিখেছিল, In an area of about 200 sq miles the inhabitants surrounded by riotous mobs, are being massacred, their houses being burnt, their womenfolk being forcibly carried away and thousands being subjected to forcible conversion, Thousands of hooligans attacked the villages, compelled them (Hindus) to slaughter their cattle and eat.

"All places of worship in the affected villages have been desecrated."[৪৪]

কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? ঐ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, নোয়াখালির জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ঐ বর্বরতা বন্ধ করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। (The District Magistrate and the Police Supperintendent of Noakhali took no step to prevent it.)

অবশ্য পুলিশের সদর্থক ভূমিকা পালন করবার কোন প্রশ্নই ছিল না। নোয়াখালি জেলার পুলিশ প্রধান নিজে ছিলেন মুসলীম লীগের পরিকল্পিত এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ মদতদাতা। তাঁর হিন্দুবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে তিনি এত বেশী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যে পুলিশের বিভাগীয় প্রধান তাঁকে ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন (The Muslim superintendent of police in Noakhali made his partisan attitude so apparent that the Divisional Commissioner had to censure him)।[৪৫] রাইটার্স বিল্ডিং থেকেও জেলা পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দাঙ্গার সাথে জড়িত হওয়ার অপরাধে যে সমস্ত লীগ সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের

(৪৩) Amrita Bazar Patrika. 23-10-46

(৪৪) The Statesman : 16-10-46

(৪৫) Bell Papers, C. S. A. S. Cambridge

যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে Support for the rioters from the League Government became apparent when it directed the police to discontinue prosecutions against a large number of those arrested।[৪৬] দুঃখজনকভাবে উদারপন্থী বলে পরিচিত ফজলুল হকও মুসলমান দাঙ্গাকারীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য তদ্বির করেছিলেন। (Fazlul Huq himself went to Comilla to secure the release of some of the accused.)[৪৭]

ভি পি মেনন 'নোয়াখালি দাঙ্গা' সম্পর্কে লিখেছিলেন, "It was an organised attack engineered by the Muslim League and carried out with the connivance of the administrative officials."[৪৮]

'আমরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর ঐ সময় আলোড় সৃষ্টি করেছিল। নোয়াখালি থেকে জনৈক বিভূতিভূষণ দাস কলকাতায় তাঁর ভাই সুধাংশুভূষণ দাসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ঐ চিঠিটি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল—

"১০ তারিখ রাতেই আমাদের সকলকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। ঐ দিন রাতে বিরাট সংখ্যক এক মুসলমান জনতা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। ওরা আমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ওরা আরো বলে যে 'হাই-কমান্ড' নাকি সমগ্র নোয়াখালি জেলাকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করতে বলেছে। এই ভাবে ওরা চাটখিল, রামপুর, দাসমেরিয়ার সমস্ত গ্রামবাসীকেও মুসলমান হতে বাধ্য করেছে।" [৪৯]

ধর্মান্তকরণের পরই নব মুসলমানদের ঐসলামিক নামকরণ করা হত। নামকরণের ব্যাপারে অবশ্য মুসলমানরা খুব সদয় ছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তাদের পছন্দ মত নাম বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হত। যেমন খালিশপাড়ায় প্রিয়ময় চক্রবর্তী নাম নিয়েছিলেন 'মৌলভী হায়দার আলি চৌধুরী ঠাকুর।' "সদয় মুসলমানরা 'চৌধুরী, ঠাকুর ও মৌলভী প্রভৃতি খেতাব বংশ মর্যাদা ও উচ্চবর্ণের পরিচয় হিসাবের আমাদের দিয়েছিল।"

নামকরণের পরই হিন্দুদের বাধ্য করা হত গোস্ত খেতে এবং কলমা পড়তে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও স্পষ্ট মনে রেখেছেন তেতুঁইয়া বাবুপুর গ্রামের দেবেন্দ্র কুমার নাথ। "কানে আঙুল দিয়ে মাথায় রুমাল বা গামছা দিয়ে আমরা কলমা পরতাম—

---

(৪৬) Modern Review : May, 1947

(৪৭) Modern Review : May, 1947

(৪৮) V. P. Menon : Transfer of Power, P-322

(৪৯) Amrita Bazar Patrika. 19-10-46

"কলমা তোয়ুব লাহে লাল্লা
ইল্লালাহ মহম্মদের রসুরইল্লা।"

কিন্তু এত করেও খাঁটি মুসলমান হওয়া সম্পূর্ণ হত না যতক্ষণ না ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বাড়ির মেয়েকে মুসলমানরা বিয়ে করত। "আমাদের পাশের গ্রামে এক ভদ্রলোকের ছয় বছরের একটি মেয়েকে 'কলমা' পড়িয়ে একটি মুসলমান ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুরা যে মুসলমান হয়ে গেছে এটা প্রমাণ করাই ছিল এই বিয়ের উদ্দেশ্য," জানিয়েছিলেন বেগমগঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা উত্তম বসু।

হাজিগঞ্জ থেকে উদ্ধার পাওয়া জনৈক ভুক্তভোগী তাঁর করুণ অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন, "ওরা বলল আমাদের বাড়ির মেয়েদের ওদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। আমার মামাতো বোন দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। দেখলাম অনেকেরই চোখ ওর দিকে। গ্রামের লীগের প্রেসিডেন্ট মামার কাছে ওকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিল। মামারও না বলার কোন উপায় ছিল না। ঐ মুসলমান লোকটি তখন ষাটের ঘরে। আমার মামাতো বোন মাত্র পনের। আমরা সবাই মিলে অনেক পরামর্শ করবার পর ঠিক হল যে আমিই আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করব। সেইমত মৌলভীকে জানালাম যে ইসলাম ধর্মে মামাতো বোনকে বিয়ে করবার বিধান আছে, এবং আমরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছি। ভাগ্যগুণে উনি রাজী হয়ে গেলেন। সাতদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করলাম। পরে মিলিটারি গিয়ে আমাদের উদ্ধার করে।"

এত দুঃখ বেদনার মধ্যেও কিছু কিছু মজার ঘটনা ঘটে যেত যার কথা ভাবলে এখনও হাসিতে ফেটে পড়েন সেদিনের ভুক্তভোগী হিন্দুরা। "আমরা তো মুসলমান হয়ে গেলাম। ওরা বলল, 'তোমরা মুসলমান হয়ে গেছ ঠিকই, কিন্তু গোস্ত তো খাওনি। তবে তোমাদের গোস্ত খাওয়ার অভ্যাস নেই, তাই আগে আমরা একসাথে সিন্নী খাব, তারপর গোস্ত খাওয়া হবে'। আমরা প্রায় হাজার দুই লোক একসাথে সিন্নী খেতে বসেছি, এমন সময় কে এসে খবর দিল 'শিখ' এসেছে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা শিখদের খুব ভয় পেত। বিশেষ করে কলকাতা দাঙ্গার সময় শিখরা যে বিক্রম দেখিয়েছিল, সে কথা তখন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে। 'শিখ আসছে' এই কথা শুনেই মুসলমানরা 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে অন্যান্য মুসলমান গ্রামগুলিকে সতর্ক করে পালিয়ে যেত। যাইহোক, সেদিন শিখ আসছে শুনেই মুসলমানরা বলতে শুরু করল, তোমরা কেউ মুসলমান হওনি। তোমরা সব হিন্দুই আছ। আর তারপর দৌড়।

আসলে কি হয়েছিল, চৌমহানী স্টেশনে এক ওয়াগন লোহার রড (rod) এসেছিল। পূর্ববাংলার লোকেরা রডকে বলে 'শিক'। সেই কথাটাই মুখে মুখে রটে যায় যে 'শিখ' এসেছে।"

সমগ্র নোয়াখালি জেলাকে 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করতে প্রয়োজন ছিল হিন্দু সমাজের শিরদাঁড়াটা ভেঙে দেওয়া। তাই দাঙ্গাকারীরা প্রথমে তাঁদের উপরই আঘাত হানল যাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তা এরকম—

"১০ই অক্টোবর বেগমগঞ্জ বাজার এলাকায় মুসলীম লীগের একটি সভা চলছিল। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন গোলাম সরোয়ার। সভায় প্রায় পনেরো হাজার শ্রোতার সামনে তিনি তীব্র হিন্দু বিদ্বেষী বক্তব্য রাখেন। সেখানে থানার দারোগা নিজে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনেই এসব চলতে থাকে। সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত জনতা বাজারে হিন্দু দোকানগুলি আক্রমণ করে। লুঠ করবার পর সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর জনতা আলাদা আলাদা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

"এমনই একটি দল স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এরপর জনতা সুরেন্দ্রবাবুর কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা অনেক হিন্দুনারী ও শিশু ঐ কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই আগুনে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। যারা কোনোক্রমে এই জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদেরও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

"অপর একটি দল নোয়াখালির District Bar-এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি (করপাড়া গ্রাম) আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে দাঙ্গাকারীরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশের হিন্দুগ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দেবস্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রলাল রায় বেগমগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এবং দ্রুত পুলিশী নিরাপত্তা দাবী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশাসনিক কোন সাহায্যই তিনি পাননি।"

"পরদিন সকাল আটটায় এক বিরাট জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেন। এভাবে পর পর তিনবার দাঙ্গাকারীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেও চতুর্থবার তারা সফল হয়। মুসলীম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে আক্রমণকারীরা প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর তাঁর পরিবারের সবাইকে এবং সবশেষে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করা হয়।"[৫০]

---

(৫০) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

রাজেন্দ্রলাল রায়ের কাটা মাথা একটি রূপার থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ারকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে তাঁরই দুই সেনাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের দুই সুন্দরী মেয়েকে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করে।[৫১]

রাজেন্দ্রলাল রায় বা সুরেন্দ্র কুমার বোসকে এভাবে হত্যা করার পিছনে মুসলীম লীগ নেতাদের যে পরিকল্পনা ছিল তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই অধ্যাপক এম. এল. রায়। ইনি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন, "মুসলমানরা সমস্ত নোয়াখালিকেই ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তাই ওরা বেছে বেছে এমন লোকদেরই প্রথম আক্রমণ করেছিল যাঁরা ওদের বাধা দিতে পারতেন। আমাদের পরিবারের সকলের মৃত্যুর এটাই একমাত্র কারণ।[৫২]

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। পুলিশ কখনোই আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে যায়নি, বরং তাদের 'রক্ষাকর্তা'র ভূমিকা পালন করতে অস্বীকার করেছিল। সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস নোয়াখালি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, "No Police help was given to the persons and families attacked though timely appeals for help were made."[৫৩]

দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং রাজ্য সরকারের দাঙ্গাকারীদের সাহায্যদান, এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল খুবই জরুরী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী নোয়াখালিতে হিন্দুদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "যুদ্ধের সময় শত্রুর উপর ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের কথা তবু বোঝা যায়। কিন্তু নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের উপর এরকম সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার কথা ভাবা যায় না। কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এই বলে বাংলার মন্ত্রীসভাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে তারা বাংলায় একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা খেলছে যা অন্যান্য রাজ্যের মানুষদেরকেও উত্তেজিত করে তুলবে।"[৫৪]

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ কংগ্রেসের নীতি বিরোধী—এই যুক্তির মারপ্যাঁচে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপদার্থতার সুযোগ নিল বাংলার রাজ্য সরকার। হিন্দুদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, দাঙ্গার তের দিন পরেও প্রশাসন হিন্দুদের নিরাপত্তার কোন আশ্বাস দিতে পারেনি। বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো মানুষদের কাছে সামান্যতম ত্রাণ পাঠানোর প্রয়োজনও

---

(৫১) বিনয়ভূষণ ঘোষ ঃ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও বাঙালী, পৃঃ ৬৮ The Statesman : 16-10-46

(৫২) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

(৫৩) Amrita Bazar Patrika. 23-10-46

(৫৪) ঐ 18-10-46

সরকার অনুভব করেনি। হিন্দুদের এই দুরবস্থার কথা জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "আজ দাঙ্গার তের দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখনও নোয়াখালি জেলার লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, রায়পুর, বেগমগঞ্জ ও সেনবাগ থানার ১২০টি গ্রামের প্রায় ৯০ হাজার হিন্দু এবং ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ থানার প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু দুর্বৃত্তদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। ঐ অঞ্চলের মানুষের উপর মৃত্যুর ছায়া দ্রুত নেমে আসছে। সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে এখনই ওখানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো উচিত। কারণ ঐ মানুষগুলির বেশীরভাগের কপালেই গত কয়েকদিন কোন খাবার জোটেনি। এখন একমাত্র সৈন্যবাহিনীই পারে ওদের রক্ষা করতে।"[৫৫] ["For the 13th day today, about 120 villages in Ramganj, Lakshmipur, Raipur, Begamganj and Senbag thanas in Noakhali district with a Hindu population of 90,000 and nearly 70,000 villagers in Chandpur and Faridganj thanas in Tippera (Tripura) district remained besieged by hooligans, Death stares the people in these areas in their face and immediate rushing of supply to these areas with the help of military, who alone could do it, would save the lives of these people, most of whom have been without food for the last few days."]

নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা কবলিত গ্রামগুলিতে এমন পরিবারের সংখ্যা খুব কমই ছিল, যে পরিবারের কোন না কোন মেয়ে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়নি।

নোয়াখালির দাঙ্গায় পীড়িত মানুষদের সাহায্য করবার জন্য বেসরকারীভাবে বেশ কিছু 'রিলিফ কমিটি'কে পাঠানো হয়েছিল। মিস্ মুরিয়াল লিস্টার ছিলেন এই রকম একটি 'রিলিফ কমিটি'র সদস্য। ১৯৪৬-এর ৬ই নভেম্বর একটি রিলিফ সেন্টার থেকে মিস লিস্টার লিখেছিলেন, "দুর্দশা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল নারীদের। এদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে আপন স্বামীকে নিহত হতে দেখেছে এবং তারপর বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্বামীর হত্যাকারীদেরই কোন একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। নারীদের চোখে ছিল মৃতের চাহনি। সে চাহনি হতাশার অভিব্যক্তি নয়। কারণ হতাশারও একটা ক্রিয়া আছে। এ যেন সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত অন্ধকার। গোমাংস ভক্ষণ ও ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ বহু লোকের উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল। এবং তা না করলে মৃত্যুই ছিল দণ্ড।"[৫৬] ("Worst of all was the plight of women. Several of them had to watch their husbands being murdered and then be forcebly converted and married to some of those responsible for their death. Those women had a

(৫৫) Amrita Bazar Patrika. 23-10-46

(৫৬) V. V Nagarkar—Genesis, P-446

dead look. It was not despair, nothing so active as that. It was blackness...the eating of beef and declaration of allegiance to Islam has been forced upon many thousands as the price of their lives.")

মিস্টার সিম্পসন, আই. সি. এস. 'নোয়াখালি দাঙ্গা'র ভয়াবহ অবস্থা তদন্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে একটি এলাকায় তিনশোর বেশী এবং আর একটি এলাকায় চারশোর বেশী অসহায় নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।"[৫৭] হিন্দু মেয়েদের উপর মুসলমানরা এ ধরনের অসম্মানজনক আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে। যেহেতু হিন্দুরা পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে নারীদের শ্রদ্ধা করে, তাই মুসলমানদের ধারণা ছিল, হিন্দু নারীকে অপমান করতে পারলেই হিন্দু ধর্মকে আঘাত করা যাবে। (To the Muslim crowd, violation of the honour of Hindu women meant the exposure of the most protected aspect of the Hindu identity and religion.)

যে জান্তব বর্বরতার সাহায্যে নোয়াখালিতে দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছিল তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি 'রিপোর্ট' করতে গিয়ে যে পৈশাচিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন ঃ "নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঘটনাটি বলেছিল। ১০ই অক্টোবর সকালে একদল লোক ঐ মেয়েটির বাড়িতে এসে মুসলীম লীগের তহবিলে পাঁচশ টাকা চাঁদা চায়। চাঁদা না দিলে বাড়ির সবাইকে খুন করা হবে বলে ওরা হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির বাবা ওদের পাঁচশ টাকা দিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ বাদে ওরা আবার আসে, সঙ্গে এক বিরাট জনতা। ঐ বাড়ির জনৈক অভিভাবক, যিনি আবার পেশায় মোক্তার, ঐ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ করবার আগেই তাঁর মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর গুণ্ডারা পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটিকে (মেয়েটির দাদু) খুন করে। এবার মেয়েটির বাবার পালা। মেয়েটির বাবাকে তাঁরই সদ্য খুন হওয়া বাবার মৃতদেহের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটির ঠাকুমা তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ছেলের দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং ওদের কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন। কিন্তু তাতে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মহিলার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তাঁর অচৈতন্য দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার আবার ওরা মেয়েটির বাবাকে মারতে উদ্যোগী হয়। মেয়েটি ভয়ে এতক্ষণ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। বাবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঐ ঘাতকের হাতে গায়ের গহনা ও চারশ টাকা দিয়ে তাকে কাকুতি মিনতি করে তার বাবাকে না মারবার জন্য। ঐ ঘাতক তখন বাঁহাতে মেয়েটির কাছ থেকে গহনাগুলি গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের দা দিয়ে মেয়েটির

(৫৭) বিনয়ভূষণ ঘোষ ঃ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও বাঙালী, পৃঃ ৬৪

বাবার মাথা তাঁর দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে।"[৫৮]

নোয়াখালিতে হিন্দুদের এই মুসলমান বর্বরতা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য গান্ধীজীকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু মহাত্মা নোয়াখালি আসতে সম্মত হলেন না। কারণ নোয়াখালি গিয়ে তাঁর 'কর্তব্য' কী হবে 'ঈশ্বর' তাঁকে নির্দেশ দেননি। তাই দাঙ্গাপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ জানিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। দিল্লীতে বসে গান্ধীজী যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

"Ever since I have heard the news of Noakhali, indeed, ever since the blood bath in Calcutta, I have been wandering what my duty is God shall show me the way."[৫৯]

শুধু তাই নয়, দাঙ্গার জন্য দায়ী মুসলীম লীগ বা দাঙ্গার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দায়ী সুরাবর্দীর সাম্প্রদায়িক প্রশাসন সম্পর্কেও তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজী হলেন না। তাঁর নিজের কথায়, "২৩শে অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে মিটিং বসবে তার আগে আমি মুখ খুলব না।"[৬০]

কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর এই অসহায় দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল মুসলীম লীগের নেতারা। সুরাবর্দী এক 'প্রেস-কনফারেন্স' ডেকে ঘোষণা করলেন, "নোয়াখালিতে সম্পূর্ণ অরাজকতার কোন চিহ্নই দেখা যায়নি। কিছু বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে মাত্র" (We don't see any sign of complete disturbance. Generally speaking, there are a few houses which have been damaged.)[৬১]

২৪শে অক্টোবর মুসলীম লীগের তরফ থেকে যে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল সেখানেও দাঙ্গার পৈশাচিকতার কথা অস্বীকার করা হল। ঐ বিবৃতিতে দাবী করা হল "নোয়াখালিতে আদৌ এক সম্প্রদায়ের উপর আর এক সম্প্রদায়ের আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটেনি। কিছু সমাজবিরোধী গণ্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। ধর্ষণ বা নারীদের উপর অত্যাচারের কোন ঘটনাই ঘটেনি। পত্রিকাগুলিই এই নিয়ে মিথ্যা হৈ চৈ করছে।"[৬২]

জিন্নাও দাবী করলেন, "নোয়াখালি সম্পর্কে খবরের কাগজগুলিতে যা লেখা হয়েছে সেগুলি সবই আষাঢ়ে গল্প।"[৬৩]

ইংরেজ রাজপুরুষেরাও মুসলমান নেতাদের সাথে গলা মেলালেন। বাংলার ইংরেজ

---

(৫৮) The Statesman : 26-10-46

(৫৯) Amrita Bazar Patrika. 17-10-46

(৬০) The Statesman : 20-10-46

(৬১) ঐ 21-10-46

(৬২) Amrita Bazar Patrika. 25-10-46

(৬৩) ঐ 25-10-46

গভর্নর দাবী করলেন, নোয়াখালিতে দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা সামান্য এবং তা তিন অঙ্ক (three figure category) অতিক্রম করবে না। তাঁর এই মিথ্যা দাবীর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোশালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজী সুভাষ বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন "গভর্নরের এই দাবীর ভিত্তি কী আমি জানি না। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে তা থেকে এটা পরিষ্কার, মৃতের সংখ্যা অনেক বেশী, এবং চার অঙ্কের (four figure category)-এর কম নয়। একমাত্র সুরেন্দ্র কুমার বোসের নারায়ণপুরের কাছারি বাড়িতে একদিনে একই সাথে চারশ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।"[৬৪]

কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য জে বি. কৃপালনী সেদিন নোয়াখালি ঘুরে যা দেখেছিলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই ; "নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার জনউন্মত্ততার কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা দরকার। ঐ উন্মত্ততার সবকিছুই ছিল প্রশিক্ষিত নেতৃত্বের অধীনে ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত। রাস্তাঘাট কেটে দেওয়া হয়েছিল, যত্রতত্র বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুণ্ডাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দুকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হয়েছে অথবা জোরপূর্বক বিবাহ করা হয়েছে। তাদের পূজাস্থানকে অপবিত্র করা হয়েছে। এমনকি শিশুদের প্রতিও কোনরকম করুণা দেখানো হয়নি। আর এইরকম পরিস্থিতিতেও স্থানীয় প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রাদেশিক সরকারও ছিল নিষ্ক্রিয় এবং ভাইসরয় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন।"[৬৫]

ভাইসরয় শুধু যে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, মুসলমানদের হাতে হিন্দু মেয়েদের এই অসম্মানকে তিনি খুব 'স্বাভাবিক' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'স্বাভাবিক', কারণ "মুসলমান বাড়ির মেয়েরা হিন্দু বাড়ির মেয়েদের মত এত সুন্দরী নয়।" (Large scale abduction of Hindu women (by Muslims) was quite natural since Hindu women were more handsome than Muslim women।[৬৬]

গান্ধীজী নোয়াখালির হিন্দুদের মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক অসাধারণ 'অহিংস' পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের আহ্বান জানালেন "তারা যেন কখনোই অহসায়ভাবে মৃত্যু বরণ না করে। বরং, তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরোবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।"

ধর্ষিতা বা অপহৃতা মেয়েদের কাছে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন, তারা যেন তাদের

---

(৬৪) ঐ 23-10-46

(৬৫) ঐ 22-10-46

(৬৬) J. B. Kripalani : Gandhi—His Life and Thought. P-286

অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ, "মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুতরাং খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং এর জন্য একটুও শোক করা উচিত নয়। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর এই অত্যাচার (ধর্ষণ ও অপহরণ) বন্ধ হবে।" (women must know how to die...women (should) face death bravely and without a murmur. Then only would the terrible killing now going on, stop)[৬৭]

গান্ধীজীর অহিংসার এই উদ্ভট ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী। তিনি তখন নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন, "গত কয়েকদিন ধরে আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কিছু করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর (হিন্দু) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।" (from what I have seen and heard the day before and yesterday. I am clearly of the opinion that whatever the Government's, provincial or central, may or may not do, every Bengali, male or female, has to defend himself or herself.)[৬৮]

আচার্য্য কৃপালনী আরও বললেন, "আমি যদিও সম্পূর্ণ অহিংসার বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রত্যেক বাঙালীর সামনে আমি রাজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর পরিবারের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই যাঁরা দুদিন ধরে লড়াই করে আক্রমণকারী উন্মত্ত জনতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।"[৬৯]

নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর এই আরণ্যক বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হল। দাঙ্গায় নিহত হিন্দুদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বোম্বেতে ব্যবসায়ীরা সমস্ত দোকান বাজার বন্ধ রাখল, বেনারসে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করল, পাটনা ও দিল্লীতে ধর্মঘট পালিত হল। দিল্লী, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, এমনকি মুসলীম লীগ শাসিত সিন্ধু প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা দীপাবলী উৎসবে আলো জ্বালানোর চিরাচরিত ঐতিহ্য বর্জন করে 'Black Diwali' পালন করল।

বাংলায় কিন্তু উৎসবের আড়ম্বর কম হল না। প্রতিবারের মতো ছেচল্লিশেও কলকাতায় যথাযথ ধূমধামের সাথে কালীপূজা উদ্‌যাপিত হল। নোয়াখালির নিপীড়িত বাঙালীদের প্রতি

---

(৬৭) The Statesman : 18-10-46

(৬৮) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

(৬৯) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

সমবেদনা জানিয়ে বাঙালী কোথাও আনন্দ ও আড়ম্বরে বিলাসিতা বর্জন করতে প্রস্তুত ছিল না। এমনকি নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলার কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হয়েছে বলেও তৎকালীন খবরের কাগজগুলিতে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এ বাঙালীর প্রগতিশীলতা না আত্মপ্রবঞ্চনা তা জানবার জন্য অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। নোয়াখালি দাঙ্গার মাত্র দশ মাসের মধ্যেই যে নতুন রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হল, এক কাপড়ে এক কোটি বাঙালীকে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল।

২৪শে অক্টোবর হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা দিল্লীতে গান্ধীজীর হরিজন কলোনির প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হল। তারা গান্ধীজীকে নোয়াখালিতে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দীর মন্ত্রীসভা বাতিল করবার জন্য ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানাল। কিন্তু গান্ধীজী পুনরায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে নোয়াখালির সমস্ত হিন্দুকে ইসলামের তরবারির কাছে আত্মসমর্পণ করবার পরামর্শ দিলেন, কেননা, মুসলমান আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়ার অর্থই ছিল 'অযথা' রক্তপাত।

তাই মহাত্মা তাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর উপদেশ, "to get killed, but not to kill."[৭০]

কিন্তু ২৯-১০-৪৬ এ সমস্ত পত্রিকায় দুটি পরস্পর বিরোধী খবর একই সাথে প্রকাশিত হল। নোয়াখালির দাঙ্গা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে 'গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। অন্যদিকে 'বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়েছে।' প্রথম খবরটির জন্য সবাই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি ছিল অপ্রত্যাশিত।

ঊনত্রিশ অক্টোবর, ১৯৪৬, আমেরিকা।

সফরের প্রথম ভাষণ দিলেন বেগম শা নওয়াজ। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় এসেছেন। পাকিস্তানের সমর্থনে আমেরিকার জন সমর্থন সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের এই সফর। কলকাতা ও নোয়াখালিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা ভালোভাবে নেয়নি আমেরিকার মানুষ। ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে হিন্দুদের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মার্কিন মুলুকে।

লীগের প্রতিনিধি হিসাবে পাঞ্জাব আইন সভার সদস্যা বেগম শা নওয়াজ এবং মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এ. এইচ. ইস্পাহানি আমেরিকায় এসেছেন। উদ্দেশ্য যদিও পাকিস্তানের যৌক্তিকতা মার্কিনীদের বুঝিয়ে বলা, কিন্তু সুযোগ করে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান যতদিন ভূমিষ্ঠ না হবে ততদিন দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী এবং মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। (India is heading for a great civil war

(৭০) Amrita Bazar Patrika. 25-10-46

(৭১) ঐ 30-10-46

unless the question of Pakistan is settled. We are sitting on a bomb in India. That is what very few people abroad realised. The sooner the question is solved, the better it will be for everyone. We Muslims are prepared to sacrifice everything in our fight for our ideal.)[৭১]

এই হুমকি দেওয়ার অধিকার অবশ্য ওঁদের আছে। নোয়াখালিতে মুসলমানরা বিজয়ী, হিন্দুরা বিজিত। পরিকল্পনা অনুসারে বিহারেও দাঙ্গার জন্য মাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মুসলিম লীগ তাদের পরিকল্পনা গোপন করেনি। পাকিস্থানের জন্য দেশের সর্বত্রই দাঙ্গা সংগঠিত করা হবে। কলকাতা-নোয়াখালি পাকিস্থান পরিকল্পনার একটা ছোট্ট প্রদর্শন মাত্র। (That the events in East Bangal were but part of all-India battle for Pakistan)[72]

কিন্তু বিহারের দাঙ্গা নোয়াখালির পথে চলল না। লীগের আশা ধুলিসাৎ করে মুসলমানরা সেখানে রয়ে গেল বিজিতের দলে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ চোখে সরষে ফুল দেখলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রমাদ গুণলেন। গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে কলকাতা থেকে সোজা বিহার যেতে চাইলেন (on hearing of the Bihar truoble Gandhiji wanted to change his programme and proceed there immediately)[73]

দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে গান্ধীজী দাঙ্গা পীড়িত বাংলায় আসতে পারেননি। এখন, নোয়াখালির পথে কলকাতা এসেও, বাংলার এই জেলাটিড সফরের পরিকল্পনা বাতিল করে গান্ধীজী বিহার যেতে চাইলেন। পণ্ডিত নেহরু বিহার ছুটে এলেন তাঁর মন্ত্রীসভার চার সদস্যকে নিয়ে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লিখল, "বাংলার থেকে বিহার অন্ততঃ এই বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান যে তার বিপদকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তার সাহায্যে দ্রুত উপস্থিত হয়েছেন, যে সাহায্য বাংলা তার যন্ত্রণার দিনগুলিতে পায়নি।" কিন্তু এই 'বিখ্যাত ব্যক্তিদের' এই তৎপরতা কী তাঁদের বিহার প্রীতির পরিচয়, না বিহারে যারা মার খাচ্ছিল শুধুমাত্র সেই সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির পরিচয়? কারণ, বাংলাতে ঐ সম্প্রদায়ই আক্রমণকারীর ভূমিকায় ছিল। তাই ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিরা বাংলায় আসবার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

সুতরাং, বিহার দাঙ্গা শুরুর চারদিনের মাথায়, ৩রা নভেম্বর নেহরুর নেতৃত্বে চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিহারে এসে হাজির হলেন। কিন্তু ষোল আগষ্ট থেকে তিন নভেম্বর; এই দীর্ঘ প্রায় তিন মাসের মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাংলায় আসবার সময় বা সুযোগ পেলেন না।

---

(৭২) V.P. Menon : Transfer of Power, P-320-1

(৭৩) J.B. Kripalani : Gandhi : His Life and Thought, P.260

নেহরু এবং কংগ্রেসের এই দু'মুখো নীতির সমালোচনা করে সেই সময় অনেক চিঠি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। জনৈক সি. এল. মেহেতার লেখা সেদিনের একটি চিঠি এখানে প্রকাশের উল্লেখ রাখে—

"তথাকথিত জাতীয় সরকার হয়তো একটা নতুন যুগের সূচনা করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখবার অদ্ভুত নীতি মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোন একজন (মুসলমান) উপজাতি মানুষের সামান্য রক্তপাত হলে নেহরু হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চিৎকার শুরু করেন। কাশ্মীর সরকার সেখানে (মুসলমান) বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর দু'একটা গুলি ছুঁড়লেই নেহরু তাঁর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু হায়দ্রাবাদে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বা বাংলার নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনের ঘটনা নেহরু ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুকম্পার সৃষ্টি করে না, পাছে তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে যান।"[৭৪]

বিহারে দাঙ্গার ভয়াবহতায় মুসলিম নেতৃবৃন্দও হতভম্ব হয়ে পড়লেন। প্রায় একই সাথে বোম্বে, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেও ব্যাপক হিন্দু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বাস্তবিকই, এ ছিল এক তীব্র হিন্দু প্রতিদানের পালা। 'নোয়াখালি দাঙ্গা' শুরুর দীর্ঘ আঠার দিন পরে মুসলিম লীগ তাদের বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। এবার কিন্তু আর বিবৃতি দিতে দেরী হল না।

সবচেয়ে অসহায় লাগছিল মহম্মদ আলি জিন্নাকে। সেই তেজ আর নাই। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র সময় তাঁর গলায় যে ঔদ্ধত্য ছিল, এবার আর তার কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কলকাতা দঙ্গার সময় তিনি হিন্দুদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন তাঁকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু বিহারে তীব্র হিন্দু প্রতিক্রিয়া তাঁকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। বন্যায় নদীর দু'কূলই প্লাবিত হয়, এই চরম সত্য এবার তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন।

নেহরু বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা ভ্রমণ করলেন। তাঁর মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে নিয়ে তিনি সেখানে বেশ কয়েকটা 'শান্তি সভায়' ভাষণ দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নোয়াখালির দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি কথাও নেহরু উচ্চারণ করলেন না। নোয়াখালিতে নির্বিচারে হিন্দু নিধনের জন্য যে মুসলিম লীগ দায়ী, ভুলেও একটি বারও তাঁর মুখ থেকে এই অভিযোগ বের হল না। বরং, 'নোয়াখালি দাঙ্গার অতিরঞ্জিত খবর' প্রকাশ করে হিন্দুদের অকারণে উত্তেজিত করবার জন্য তিনি সংবাদপত্রগুলিকে দায়ী করলেন, এবং এই অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়ারও হুমকি দিলেন। তিনি যে ভাষায় সেদিন কথা বলেছিলেন, "কিছু লোক মনে করছে যে তারা পূর্ববঙ্গে অত্যাচারের বদলা নিচ্ছে। সেটা খারাপ ছিল।

---

(৭৪) Amrita Bazar Patrika–1. 11. 46

কিন্তু সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত খবর বের করা হয়েছিল। এর জন্য দোষীদেরকে (culprits) কাঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার।'' "Some pepole believe they are taking revenge for atrocities in East Bangal. It was bad enough. But exaggarated reports were published in the press. Culprits must be punished severely."[৭৫]

অর্থাৎ পূর্ববাংলায় যারা হত্যা, লুট ও ধর্ষণ করল, তাদের নিন্দা বা ধিক্কার জানানোর মত একটি শব্দও অত ভাল ইংরাজী জানা নেহরুর শব্দ ভাণ্ডারে ছিল না। কিন্তু সেই বিভীষিকার খবর যারা বের করল তারা নেহরুর চোখে কালপ্রিট (culprit) হয়ে গেল।

শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না নেহরু। বিহারের সমস্ত হিন্দু এলাকাগুলি বোমা ও মেশিনগান চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন তিনি। "The government had to follow such a course by firing machine guns, and bombing the people."[৭৬]

নেহরুর এই হুমকি আক্ষরিক অর্থেই পালন করা হল। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে দুই শতাধিক মানুষ নিহত হল বিহারে।

বিহারে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার 'কংগ্রেস নীতি' কবরে চাপা পড়ল। বিহারের দাঙ্গার পরিপেক্ষিতে নেহরু যুক্তি দিয়েছিলেন, 'No government could tolerate such lawlessness.' কিন্তু মাত্র পঁচিশ দিন আগে নোয়াখালি দাঙ্গার সময় নেহরুর এই চৈতন্যোদয় হয়নি। বরং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আবেদন খারিজ করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কংগ্রেসের নীতি নয়।

নেহরু তাঁর এই মুসলমান প্রীতির দক্ষিণাও পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। মুসলিম লীগের তরফ থেকে তাঁকে 'ধন্যবাদ' জানানো হল। লীগ নেহরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল, "Pundit Nehru's indefatigable effort there (Bihar) is now some consolation for the distressed Muslims."[৭৭]

গান্ধীজীও দু'মুখো নীতি গ্রহণ করলেন। নোয়াখালিতে হিন্দুদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল তারা যেন বাধা না দিয়ে সাহসের সাথে মুসলমানদের তরবারির কাছে আত্মসমর্পন

---

(৭৫) Amrita Bazar Patrika—5.11.46
(৭৬) ঐ —7.11.46
(৭৭) ঐ —10.11.46
(৭৮) J. B. Kripalani : Gandhi : His Life and Thonght. P-260.

করে। কিন্তু বিহারে তিনি তাঁর এই অহিংসার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হলেন। গান্ধীজী নিজে কেন্দ্র এবং রাজ্য (বিহার) সরকারগুলিকে যে কোন উপায়ে (নিশ্চয়ই অহিংস নয়) দাঙ্গা দমন করতে বললেন। (Gandhi asked the central and provincial governments to do everything in their power to control the situation)[৭৮]

বিহারে 'মুসলমানদের উপর অত্যাচারের' প্রতিবাদে গান্ধীজী তাঁর আহার কমিয়ে দিতে লাগলেন (Gandhiji reduces his diet "as a penance for the violence and lawlessness in Bihar")[৭৯] এবং হুমকি দিলেন দাঙ্গা না থামলে তিনি আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন।

ভাগ্যের পরিহাস, মাত্র আগের দিন গান্ধীজী নোয়াখালিতে এসে পৌঁছেছেন। দশ-ই অক্টোবর দাঙ্গা শুরুর পর এই প্রথম গান্ধীজীর নোয়াখালি পদার্পণ। অর্থাৎ, দাঙ্গার চব্বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী নোয়াখালি আসবার সময় পাননি। সেখানে হিন্দুদের রক্ষা করবার কোন পথ তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁর নিজের কথায়, 'আমার কর্তব্য আমি জানি না।' কিন্তু বিহারের দাঙ্গায় তিনি পথের দিশা পেয়ে গিয়েছিলেন তখনই, কোন কালক্ষয় না করে।

অনেকেই মনে করেন, গান্ধীজী সেই সময় নোয়াখালি গিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা, এবং খুব সযত্নে এই মিথ্যা পালন করা হচ্ছে। দাঙ্গা শুরুর চব্বিশ দিন পরে যখন গান্ধীজী নোয়াখালিতে পৌঁছলেন, খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তখন দাঙ্গার রেশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। প্রথম কারণ ছিল, সেখানে তখন হিন্দুদের নতুন করে কিছু হারাবার ছিল না, মুসলমানদেরও কিছু ছিল না জয় করবার।

কিন্তু নোয়াখালির দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল বিহারে নিদারুণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দু প্রতিক্রিয়া। অনতিবিলম্বে একটা দাঙ্গা যেন আর একটা দাঙ্গার শর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এ যেন ছিল 'terrorism is dealt with counter terrorism'। তাই বিহারে হিন্দুদের শান্ত করবার প্রধান শর্ত ছিল নোয়াখালিতে হিন্দুতের উপর নামিয়ে আনা বর্বরতা বন্ধ করা। মুসলমান নেতৃত্ব এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভাইস্রয়কে জানিয়েছিলেন, "বিহারে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন যতক্ষণ না পূর্ববঙ্গে পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে।" (it could be extremely difficult to maintain order in Bihar unless the situation was controlled in East Bengal)[৮০]

---

(৭৯) The Statesman—7.11.46

(৮০) Amrita Bazar Patrika—11.11.46

এবার প্রশ্ন, সত্যি কী নোয়াখালি দাঙ্গার 'অতিরঞ্জিত' খবর সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হয়েছিল? লীগ নেতৃবৃন্দ এই অপরাধে পত্রিকাগুলিকে দোষারোপ করেছিলেন। মুসলমান নেতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেহরু 'দোষী' পত্রিকাগুলিকে শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য কী ছিল? স্টেটস্‌ম্যান (তখন ইংরেজ সরকারের সমর্থক) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, নোয়াখালি দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশী।[৮১] ১০ অক্টোবর হিন্দু নিধন শুরু হয়েছিল। ১৩ অক্টোবরের মধ্যেই সেই পৈশাচিকতা নোয়াখালি জেলার ৩০০ বর্গ মাইল অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা জেলার প্রায় ৩০০ গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরণ্যক বর্বরতা এত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে ঐ দাঙ্গা থামাতে ১,৮০০ সৈন্য ৬০০ সশস্ত্র পুলিশ, ১৩০ সাধারণ পুলিশ এবং রয়েল এয়ার ফোর্সের বিমান কাজে লাগাতে হয়েছিল।[৮২]

নারী জাতির প্রতি অত্যাচার এমন এক ভয়াবহ জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যে, নোয়াখালির দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চল ঘুরবার সময় সুচেতা কৃপালনী (আচার্য্য কৃপালনীর পত্নী) সবসময় তাঁর সাথে পটাসিয়াম্ সায়ানাইডের ক্যাপসুল রাখতেন। প্রয়োজনে সম্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করতে হতে পারে এই বিবেচনায় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির স্ত্রীর যেখানে এই নিরাপত্তাহীনতা, সাধারণ হিন্দু মেয়েদের ভাগ্যে কী জুটেছিল তা নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিহারের দাঙ্গা কি নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া? মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ, নেহরু, এমনকি গান্ধীজীও মনে করতেন বিহারের হিন্দু প্রতিক্রিয়া নোয়াখালির দাঙ্গারই পরিণতি। কিন্তু ইতিহাস তা বলে না। 'রক্তের বদলে রক্ত' এই নীতির ভিত্তিতে বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়নি। কৃপালনীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, "নোয়াখালির হিন্দুদের প্রতি সমবেদনা জানাতে চব্বিশ অক্টোবর (১৯৪৬) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'নিষ্প্রদীপ' দেওয়ালি পালন করা হয়েছিল। বিহারেও হিন্দুরা দেওয়ালিতে প্রদীপ জ্বালাবার চিরাচরিত প্রথা বর্জন করেছিল। কিন্তু মুসলমান নেতাদের উস্‌কানিতে মুসলমান মহল্লাগুলিতে আলো জ্বালিয়ে 'বিজয় উৎসব' পালন করা হয়। পরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ হিন্দুরা মুসলমান নেতাদের কাজে প্রতিবাদ জানাতে গেলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।"[৮৩]

সুতরাং নোয়াখালি প্রত্যক্ষভাবে বিহারের দাঙ্গার উত্তেজনা যোগায়নি। মুসলমান নেতৃত্বের প্ররোচনায় বিহারে দাঙ্গার পরিবেশ অনেক আগে থেকেই তৈরী করা হয়েছিল। কংগ্রেস

(৮১) The Statesman—18.10.46

(৮২) File No. 51.3.36

(৮৩) Kripalani ; Gandhi : His Life and Thought. P-264

হিন্দুদের দল এবং কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে (বিহারও কংগ্রেস শাসিত রাজ্য) মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুসলীম লীগ এই ধরণের প্রচার চালাচ্ছিল। নোয়াখালি বিজয়ের পর বিহারেও হিন্দুদের 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। আগস্ট মাসে কলকাতা দাঙ্গার সময় গার্ডেনরিচ-ওয়াটগঞ্জে যে সাতশ হিন্দু নিহত হয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই ছিল বিহার থেকে আসা কুলি ও শ্রমিক। সর্বস্বান্ত হয়ে 'দেশে' ফিরে আসা এই বিহারীদের দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিহারী আত্মীয়স্বজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে মুসলমানরা দাঙ্গার ইন্ধন যোগান দিলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

বিহারের দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণভাবেই স্পতঃস্ফূর্ত। কোন মৌলবাদী পরিকল্পনা এই দাঙ্গার পিছনে ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নোয়াখালিতে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গী হত মোল্লা ও মৌলভিরা। প্রাণের বিনিময়ে সেখানে তারা হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করত। কিন্তু বিহারে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি, যেখানে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। একটি মসজিদও বিহারে ধ্বংস করা হয়নি।

নোয়াখালিতে হিন্দুদের বাঁচাবার প্রধান শর্ত ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং গোমাংশ ভক্ষণ। কিন্তু কোন লীগ নেতা এমন অভিযোগ করেননি যে বিহারে মুসলমানদের জোর করে শুয়োরের মাংশ খাওয়ানো হয়েছে।

'নোয়াখালি দাঙ্গা'র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মেয়েদের উপর অত্যাচার। কিন্তু বিহার ছিল এই দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মুসলমান মেয়েদের ধর্ষণ বা অপহরণের কোন ঘটনা বিহারে দাঙ্গার সময় ঘটেনি। বরং হিন্দু মেয়েরা নিজেদের গহনা বিক্রি করে মুসলমানদের পুনর্বাসনে সাহায্য করেছিল। সেখানে হিন্দুরা নিজেরা গিয়ে উদ্বাস্তু শিবির থেকে মুসলমানদের তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।[৮৪] এমনকি, বিহারে দাঙ্গাপীড়িত মুসলমানদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মুসলমান মন্ত্রীকে। কিন্তু নোয়াখালির চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃপালনী জানিয়েছেন, গান্ধিজীও নোয়াখালিতে পদে পদে বাধা পেয়েছিলেন, এবং বাধা দিয়েছিলেন মুসলমানরা।

কলকাতা থেকে বিহার, মাত্র চার মাসের কম সময়ে দাঙ্গায় নিহত মানুষের সংখ্যা পনের হাজার ছাড়িয়ে গেল। আহত মানুষের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কলকাতায় দাঙ্গা শুরু করেছিল মুসলমানরা, কিন্তু পরে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার দাবানল পুড়িয়ে দিয়েছিল

(৮৪) J. B. Kripalani ; Gandhi : His Life and Thought—P.-269

দাঙ্গাবাজদের দম্ভ। নোয়াখালিতে ক্ষতিগ্রস্ত হল হিন্দুরা। মুসলমানরা বিহারে। কিন্তু দাঙ্গার প্রধান বলিদান হল ভারতবর্ষ। দাঙ্গায় কংগ্রেসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মহম্মদ আলি জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন, 'Practical leadership' কংগ্রেসের কাছে নেই। অন্যদিকে যাদের কাছে 'Practical leadership' আছে সেই হিন্দু মহাসভার সাথে নেই দেশের মানুষ। জিন্নার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, 'চাই' কথাটা জোরে চিৎকার করে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কংগ্রেস নেতৃত্ব তা মেনে নেবেন। গান্ধী, নেহরু, আজাদ কেউ-ই এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বরং প্রত্যেকে ছিলেন প্রত্যেকের পরিপূরক।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, ঐ সময় আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো কাণ্ডারী এদেশে ছিলেন না। রক্তক্ষয়ের জুজু দেখিয়ে জিন্না দেশভাগ করে নিলেন। কিন্তু এই রক্তনদীর মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখবার সাহস কোন দেশনেতা দেখালেন না। দেশ ভাগ হয়ে গেল। জননী হল সন্তান হারা। শিশু হারালো তার পিতা। স্ত্রী হারালো তার স্বামী। নারী হারালো সম্মান। কিন্তু জরাক্লিস্ট হিন্দু মন এতে উদ্বেলিত হল না। সহজভাবেই এগিয়ে চলল জীবনতরী। এটাই হয়তো দাঙ্গার সবচেয়ে বড় সাফল্য। দেশভাগের সবচেয়ে বড় অবদান।

---

architectural undertakings, including a fortress-palace, now called the Red Fort, built when he transferred the capital from Agra to Delhi. They also say that his most famous creation is the Taj Mahal. These spineless creatures called secular historians do not hesitate to paint an orthodox religious bigot as a tolerant ruler and say that, though a more orthodox Sunni Muslim than his father, he was less orthodox than his son and successor, Aurangzeb, and he was relatively tolerant of his Hindu subjects. [1]


Figure 1, Picture of Shah Jahan

But though small in number, there are honest historians too, who do not hesitate to uncover the true face of Shah Jahan. In this regard, the Keene's Handbook says, *"Shah Jahan surpassed all the Mughal emperors in autocratic pride and was the first of them to safeguard the throne by murdering all possible rivals. ....According to Sir Thomas Roe, who knew Shahjahan personally, his nature was unbending and mingled with extreme pride and contempt of all."* It also says, *"Shahjahan in open rebellion (against his own father Emperor Jahangir) seized Fatehpur Sikri and sacked the city Agra, where, according to Della Valle, a noble Italian then on a visit to India, his army committed fearful barbarities. The citizens were compelled under torture to give up their hoarded treasures, and many ladies of quality were outraged and mutilated."* [2] Here one should read rape in stead of outrage and chopping of breasts in stead of mutilation.

